দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতীয় জাতীয়তা:
জাতীয় আত্মার
উন্মোচন
..... পৃ: ১১

উনিশ শতকের
বাংলা পত্র-পত্রিকা
ও হিন্দু জাগরণ
..... পৃ: ১৯

৬৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ১১ এপ্রিল ২০১৬।। ২৮ চৈত্র - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৮।। নববর্ষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com ।।

আমার এই দেশেতে জন্ম
যেন এই দেশেতেই মরি...

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২৮ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১১ এপ্রিল - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮।। নববর্ষ সংখ্যা

Website : www.eswastika.com

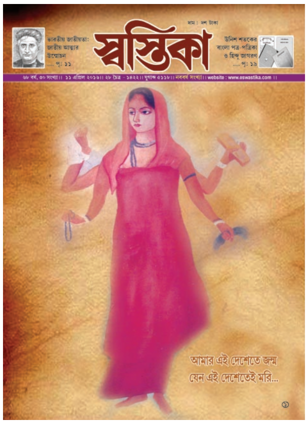

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে যোগ্য প্রার্থীকেই আপনার মূল্যবান ভোটটি দিন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

ভারতীয় জাতীয়তা, জাতীয় আত্মার উন্মোচন
□ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১১

ভারতীয় জাতীয়তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
□ এন সি দে □ ১৪

ভারতমাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কমিউনিস্টরা
□ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১৬

উনিশ শতকের বাংলার পত্র-পত্রিকা ও হিন্দু জাগরণ
□ সত্যনারায়ণ মজুমদার □ ১৯

বাংলা পাঁজির ইতিকথা □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

নেহরু-গান্ধী পরিবার ও ভারতের দারিদ্র্য
□ সদানন্দ ধুমে □ ২৭

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **চিঠিপত্র : ৩১-৩২**
□ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭**

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

— **স্বস্তিকা পরিবার**

স্বস্তিকা

১২৫তম জন্মবর্ষে বাবাসাহেব আম্বেদকর

এই বছর বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবর্ষ। তাঁর অবদানের মূল্যায়ন এখনও ঠিকমতো করে ওঠা হয়নি। ভারতবর্ষের সমাজের দুর্বলতম অংশের সেবা করে তিনি তাকে সজীব করে তুলেছিলেন। সমগ্র সমাজকে কলুষমুক্ত করেছিলেন। তাই তিনি শ্রদ্ধেয়, প্রণম্য। একথা স্মরণ রেখেই আগামী সংখ্যার বিষয় : ১২৫তম জন্মবর্ষে বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। লিখেছেন— ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ বিজয়, ড. জিষ্ণু বসু প্রমুখ।

দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেওবন্দের ফতোয়া

'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দেওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করিয়াছে দেওবন্দের দারুল উলম। উলমের যুক্তি—হিন্দুরা 'ভারতমাতাকে' দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। পূজা করিবার প্রশ্নে ইসলামের কাছে আল্লাই শেষ কথা। কয়েকদিন আগে হায়দরাবাদে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তিহাদের নেতা ওয়াইসি বলিয়াছিলেন, তাঁহার গলায় কেহ ছুরি ধরিলেও তিনি 'ভারতমাতা কী জয়' বলিবেন না। তাঁহার এই বক্তব্যে দেশ জুড়িয়া বিতর্ক তৈরি হইয়াছে। দেওবন্দের ফতোয়া সেই বক্তব্যে ঘৃতাহুতি দিয়াছে। মুসলমানদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা অবশ্য নূতন নহে। এই একই যুক্তিতে তাহারা জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' সম্পূর্ণ গাহিতে অস্বীকার করিয়াছে। যদিও ভারতের নিজস্ব চরিত্র তথা সংস্কৃতির সঙ্গে বন্দেমাতরম্ গীত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিস্ময়ের বিষয় হইলেও সত্য, স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও আমরা কে জাতীয় আর কে নহে তাহা লইয়া বিতর্ক করিতেছি। ভারত এক বিশাল দেশ। বৈচিত্র্যও ব্যাপক। ভাষা, উপাসনা পদ্ধতি, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার বিভিন্ন রকমের। এত বিবিধতা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে আবেগাত্মক ঐক্যবোধ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তাবোধ সহজাত। এর জন্য কাহারও কোনো শংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না। 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি হৃদয়ের আবেগের বহিঃপ্রকাশ, কোনো 'ফ্যাশান' বা সখ নহে। এই আবেগ কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যায় না। এই জাতীয়তাবোধ প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে এতটাই প্রোথিত যে সন্ত্রাসবাদী শক্তি ও মৌলবাদীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এখানে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুত গত দুই বছরে অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও দুই-একটি ব্যতিক্রম ধরিলে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে নাই। এক শ্রেণীর রাজনীতিক অন্যদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী তকমা দিয়া নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হিসাবে জাহির করিতে সর্বদা সচেষ্ট। তাহাদের এই অপচেষ্টা কিছুটা হইলেও জাতীয়তার ধারণাকে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা তাহার ডিএনএ-র মধ্যেই রহিয়াছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হইবার পরেও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির পাশাপাশি মসজিদের আজানও শুনিতে পাওয়া যায়।

ঘটনা হইল, দেওবন্দের ফতোয়া জারি করিবার প্রয়োজন ছিল না। কাহাকেও ভারতমাতা কী জয় বলিতে বাধ্য করা উচিত হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে এই ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া বৃটিশদের নিকট হইতে আমরা স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইয়াছি। আর আজ সেই ধ্বনি উচ্চারণ না করিতে ফতোয়া জারি করা হইতেছে। ইহা দুর্ভাগ্যজনক। তবে আশার কথা এই, মুসলমান সমাজের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যেমন লখনউয়ের প্রধান ইদগার ইমাম মৌলানা খালিদ রসিদও জানাইয়াছেন, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালবাসি, তাই এই সম্ভাষণে বাধা কোথায়?

বস্তুত শ্রদ্ধা বিষয়টি চাহিবার নহে, তাহা আকর্ষণ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ভারতকে বিশ্ব গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর প্রাণপাত করিতেছেন। আর এই কারণেই ভারতবাসীর সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসীও একদিন শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিবে—ভারতমাতা কী জয়।

সুভাষিতম্

কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।। (চাণক্যনীতি)

প্রাণীকে পরিণত করে কাল। কালই সংহার করে মানুষকে। সকলে যখন ঘুমে মগ্ন তখন কালই একমাত্র জেগে থাকে। অতএব কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

স্বস্তিকা আয়োজিত কলকাতায় জাতীয় আলোচনা সভা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চাই ভায়া বাংলাদেশ বিনা পাসপোর্ট-ভিসায় যাতায়াত : রাজ্যপাল তথাগত রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ “১৯৭১-এ ভারত বাংলাদেশের পরম মিত্র রাষ্ট্র। তখন কেন যে কেন্দ্র সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ভারত থেকে ভারতে ভায়া বাংলাদেশ বিনা পাসপোর্ট-ভিসায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যাত্রী ও পণ্যপরিবহণ চালু হওয়া উচিত ছিল আগরতলা- ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা। রাশিয়াতে এরকম রয়েছে। রাশিয়া থেকে রাশিয়া ভায়া বেলারুশ ও লিথুয়ানিয়া। জার্মানিতেও ছিল। যেমন এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যত শীঘ্র সম্ভব এইরকম ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। ভৌগোলিক দূরত্ব কম হলে বিচ্ছিন্নতাবাদ কম হবে।” স্বস্তিকা আয়োজিত জাতীয় আলোচনা সভার মূল সুরটি এভাবেই বেঁধে দিলেন প্রধান অতিথি ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায়।

গত ২৯ মার্চ, ২০১৬ কলকাতায় রোটারি সদনে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার উদ্যোগে সারা দিনব্যাপী এক জাতীয় আলোচনা সভা (National Seminar) হয়ে গেল। আলোচনার বিষয় ছিল : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী উন্নয়ন : বিষয় ও চ্যালেঞ্জ (Sustainable Development in North East India : Issues and Challenges)। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম্’ গীতের পর সকলকে স্বাগত জানান স্বস্তিকা-র প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন, স্বস্তিকার আজকের উদ্যোগ খুব ভালো। উত্তরপূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ও মনের যোগাযোগ চাই। ব্যাঙ্গালুরুতে উত্তরপূর্বের মানুষের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার হয়েছে তা লজ্জাজনক। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক এক প্রভাবী ভূমিকা পালন করতে পারে।

শ্রীরায় আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মূলত ভৌগোলিক ও জাতি চরিত্রগত। ভৌগোলিক দূর-সম্পর্কের কারণ অবশ্যই দেশভাগ। ইংরেজ আমলে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল যেমন, শিয়ালদহ-রাণাঘাট-পোড়াদহ, গোয়ালন্দ। আর একটা ‘রুট’ ছিল— পার্বতীপুর- অসম-শিলিগুড়ি-অসমের বরাক উপত্যকা। আবার কাছাড়-করিমগঞ্জ-চাঁদপুর-আখাউড়া-করিমগঞ্জ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের শারীরিক গঠন মঙ্গোলিয়ান। এ বিষয়ে সচেতন থেকে উত্তর পূর্বের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক অবদানের কথা মনে রাখতে হবে। একজন মিজোরামবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি জাপানি? এটা দুর্ভাগ্যজনক, অহোম বীর লাচিত বরফুকন সরাইঘাটের যুদ্ধে মীরজুমলার মোগলবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। এটা কতজন সাধারণ ভারতীয় জানেন?

বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের Double Transit Route without Visa-Passport চালু হোক। আর এস এস ছাড়া অন্যান্য বিবিধ সংগঠনের মধ্যে স্বস্তিকার ব্যাপক প্রসার হওয়া দরকার।

আলোচনা সভার উদ্বোধক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন, আমার কাছে উত্তর-পূর্ব ভারত মানে তিনটি এম, দুটি এ, একটা টি ও একটি এন। তিন 'এম' অর্থাৎ মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, দুই 'এ' মানে অসম ও অরুণাচল এবং টি ত্রিপুরা আর এন মানে নাগাল্যান্ড। মেইন লাইন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় ও জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী।

অর্থাৎ স্থলপথে সর্বত্র পরস্পর যোগাযোগ ব্যবস্থা চাই। আকাশপথে কলকাতা-মিজোরাম, কলকাতা-দিল্লী থেকে কম। আকাশ পথে ব্যাপকমাত্রায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া যায় না। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিবেশী বন্ধুদেশ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। কলকাতা বা ডায়মন্ডহারবারকে বড় জাহাজের উপযোগী বন্দর করে কলকাতা-চট্টগ্রাম জলপথ যোগাযোগ শুরু হোক। আশার কথা, ত্রিপুরার আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন হচ্ছে। ভারত এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাহায্য করছে। শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ভাবে গড়ে তুলতে হবে। কোহিমা-ইম্ফল ন্যাশনাল হাইওয়ে (N.H. 44) চাই। বস্তুত Super National Highway দরকার। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লাগোয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, আমদানি-রপ্তানি সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য সড়ক পথে যোগাযোগ দরকার। উত্তর- পূর্বাঞ্চলে বড় শিল্প নেই। এজন্য উদ্যোগী হতে হবে। ওখানকার কৃষিজাত পণ্য অন্যত্র বিক্রির ব্যবস্থা চাই।

উত্তর-পূর্বের ডিগবয়ে তৈল শোধনাগার এবং গোলাঘাটে কাগজের কারখানা আছে। ত্রিপুরায় গ্যাস রয়েছে। বাংলাদেশের ভেতরে অনেক লবি রয়েছে। তা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ কম কেন তার জবাব বাণিজ্যমহলকে দিতে হবে। শিল্পপতিরা নিরাপদ এলাকায় লগ্নি চান, এটা সম্ভব করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশনে ছিল এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন লেফটানেন্ট জেনারেল জে আর মুখার্জী (অবসরপ্রাপ্ত), প্রবীণ সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক, জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায়। এই অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি (অবসরপ্রাপ্ত)। লেঃ জেঃ মুখার্জী বলেন, আমার মত একটু ভিন্ন। উত্তর-পূর্ব ভারত, কলকাতা থেকে ঢাকা শিল্প-সমৃদ্ধি বা উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়েছে দেশভাগের কারণে। আমরা তো বাংলা বা বাংলাদেশ বিষয়ে কী বলবো? কলকাতা বা ঢাকা— কোথাও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। অসমের জনসংখ্যার ভারসাম্য পালটে গিয়েছে। শেষ জনগণনায় (২০১১) দেখা যাচ্ছে, অসমে তিন কোটি ১২ লক্ষ জনসংখ্যা। তার মধ্যে ৬৭.১৩ শতাংশ হিন্দু, ২৮.৪ শতাংশ মুসলমান ও ২.৪ শতাংশ খৃষ্টান। তার পরবর্তী (সেনসাস) সময়ে হিন্দু আরও এক শতাংশ কমেছে এবং মুসলমান ১ শতাংশ বেড়েছে।

নির্বাচন জেতার জন্য এই জনসংখ্যার অনুপাতকে শাসক ও বিরোধীরা ব্যবহার করছে, ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে।

গবেষক বিমল প্রামাণিক

মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক জয়ন্ত রায়

লে: জে: জে আর মুখার্জি

ড. বলরাম চক্রবর্তী

সমীর গোস্বামী, সি পি আর ও, ই. রেল

রাজনৈতিক ভোটব্যাঙ্ক তৈরির কারণে বাংলাদেশিদের অভিবাসন ও নাগরিক বা ভোটার তৈরি করানো হচ্ছে আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে। বেড়া দিয়ে এই অভিবাসন আটকানো যায় না। ৭৫ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে মায়ানমার বা বাংলাদেশ আশ্রয় দেয়নি। দিয়েছে ভারত। পরবর্তীকালে এদেরকে নাগরিক বলে মেনে নেওয়া হবে। বাংলাদেশ থেকে দু' কোটি হিন্দুও এপারে এসেছে। জনসংখ্যার ভারসাম্যের এই পরিবর্তনের পরিণতি রক্তাক্ত হতে পারে। Demographic upset leads to bloodshed। উলফা বাংলাদেশ ও চীনের প্রশ্রয় পেয়েছে। এখন চীন উলফা নেতা পরেশ বরুয়াকে পুরোপুরি মদত দিচ্ছে। ভারত লাগোয়া মায়ানমারের ভিতরে তাদের ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অভিবাসনের কারণেই অসমে বোড়োদের সঙ্গে ঝামেলা। জামাত উল মুজাহিদিন জঙ্গিরা অসম এবং বাংলাদেশ--- সর্বত্র সক্রিয়। কিছু সংখ্যক ধরাও পড়েছে। নাগাল্যান্ডে রয়েছে বিভিন্ন উপজাতিভিত্তিক জঙ্গিদল। জঙ্গিদের তৎপরতার কারণেই উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অন্য এক জনজাতি গোষ্ঠী হলো কুকি। এরাও ভয়ানক উগ্র। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সামাল দেওয়ার জন্য সঠিক নীতি চাই। মিজোরামেও বিদ্রোহ হয়েছে। অরুণাচলে দুটো জেলা উপদ্রুত— তিরুপ ও চাংলাং। সবরকম সন্ত্রাসবাদকে চীন ও পাকিস্তান সমর্থন দিচ্ছে। আগে বাংলাদেশ ছিল উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্র-সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল। এখন তা হয়েছে মায়ানমার। ব্যবসার বিনিয়োগের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত। ওরা রাস্তা ব্লক করছে। এটা ঠিক হলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিষয়ে অভিজ্ঞ সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, Demographic imbalance leads to insurgency in North-East. বাংলাদেশ ১৭টা দেশে শ্রমিক পাঠায়। তারা ডলার নিয়ে আসে। ওই শ্রমিকরা দেশে প্রতিবছর ২৫ বিলিয়ন ডলার পাঠাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা বা শিক্ষিত শ্রেণী সেখানে গিয়ে স্থায়ী হয়। টাকা পাঠায় না। যেখানেই শ্রমিকের চাহিদা সেখানেই বাংলাদেশি। তা সে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, সুরাট যাই হোক না কেন। অসমীয়া অফিসাররাই বাংলাদেশিদের অসমীয়া বানাচ্ছে।

উত্তর-পূর্বে উন্নয়নের সপক্ষে বড় বাধা হলো ড্রাগ। যা ব্যাপকহারে বার্মাতে তৈরি হয়ে মণিপুর দিয়ে আমাদের দেশে ঢুকছে। যুব প্রজন্মকে শেষ করে দিচ্ছে। বার্মায় ১১টা হেরোইন তৈরির কারখানা। এটা বন্ধ করতে হবে। বেআইনি সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আসছে চীন থেকে। চীন বাস্তবতার মাপকাঠিতে এক ক্যাপিটালিস্ট দেশ। দুনিয়া জুড়ে সশস্ত্র ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র দিচ্ছে। দোসর বাংলাদেশ। পরেশ বরুয়ার দুই দেহরক্ষী অসমীয়া নয়, তারা বাংলাদেশি— গোলাম নবী ও আলম নবী। মূল কারবার চীনা অস্ত্র বিক্রি। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে যত্রতত্র আগ্নেয়াস্ত্র সহজেই পাওয়া যায়। প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কে স্বচ্ছ নীতি চাই। বাংলাদেশ ও মায়ানমারে ঢুকেই ভারতবিরোধী উত্তরপূর্বাঞ্চলে সক্রিয় জঙ্গিদের বিনাশ করতে হবে।

অধ্যাপক জয়ন্ত রায় বলেন, ভারত সরকার ভুল নীতি নিয়ে চলছে সেই ১৯৪৭ থেকে। মণিপুরী সংস্কৃতি এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলে আজকের অবস্থা হোত না। Insurgent outfit-রা ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, আমলা সবার থেকে তোলা নেয়। এই চক্রকে দমন না করলে উত্তরপূর্বে স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়। মেঃ জেঃ গাঙ্গুলি উত্তরপূর্বাঞ্চলে নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে এই এলাকার স্থায়ী উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু নীতি গ্রহণের কথা বলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'লুক ইস্ট নীতি'কে 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-তে পরিণত করা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গবেষক ও লেখক বিমল প্রামাণিক, প্রবীণ সাংবাদিক নীলোৎপল চৌধুরী, ইগনুর প্রাক্তন ডিরেক্টর (উত্তরপূর্ব ও পশ্চিম) সুজিত ঘোষ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রের

শিক্ষা দপ্তরের (মিউজিয়াম) প্রাক্তন সচিব বলরাম চক্রবর্তী। শ্রী প্রামাণিক বলেন, ভারতবর্ষে মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের পর যা এক জটিল অবস্থায় ছিল। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অস্থির করতে ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে বাংলাদেশ সবরকমের চেষ্টা চালাত। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলত। বিগত দুই বছরে তা পরিবর্তিত হয়েছে। বিগত বছরের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, Rail ও Road Connectivity-তে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে, বাংলাদেশে ভারত- বিরোধী মনোভাব ও রাজনীতি ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। এর ফলে ২৩০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। সেখানে ভারতীয় শিল্পপতিরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছেন এবং করছেনও।

কলকাতা-খুলনা রেল যোগাযোগ চালু হবে। ভারত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। যা উত্তর পূর্বের স্থায়ী উন্নয়নে এক উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবে। ওই সফরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫০টির বেশি মউ (Mou---মেমোরেন্ডাম্ অফ্ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কেও ২৮ বিলিয়ন ডলার পড়ে আছে যা উত্তরপূর্বে ভারতে বিনিয়োগ সম্ভব। শ্রী নীলোৎপল চৌধুরী বলেন, একসময় শিয়ালদহ এন ই এফ রেলের প্রধানকেন্দ্র ছিল। মোদী সরকার আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তনে দীর্ঘ বিলম্বিত ও ঝুলে থাকা শিয়ালদহ-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথ চালু হয়েছে। ড. সুজিত ঘোষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ‘হিস্টোগ্রাফি’ পাওয়ার প্রজেক্টশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ড. বলরাম চক্রবর্তী তাঁর উত্তর পূর্বাঞ্চলে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তা ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইস্টার্ন রেলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক সমীর গোস্বামী। তিনি বলেন, North Frontier Rail-এর সদর দপ্তর অসমের মালিগাঁওয়ে। উত্তরপূর্বে রেলপথ সম্প্রসারণে সব থেকে বড় বাধা জঙ্গি গোষ্ঠীর সীমাহীন অত্যাচার। এবং তা এতটাই যে দীর্ঘদিন ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। তবুও এত বছর পরে— লামডিং-শিলচর-ব্রডগেজ রেল চালু হয়েছে। এবার উত্তরপূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের রাজধানীর মধ্যে রেল যোগাযোগ চালু হয়ে যাবে। রেলপথের (ব্রডগেজ) সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে স্থায়ী উন্নয়ন অসম্ভব। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ, নয়নাভিরাম দৃশ্য— পর্যটন শিল্পের পক্ষে খুবই লাভজনক হতে পারে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীন সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে ধন্যবাদ জানান স্বস্তিকার সহ সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল।

ড. সুজিত ঘোষ

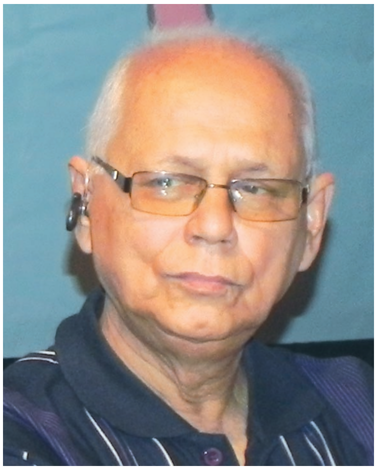

সাংবাদিক নীলোৎপল চৌধুরী

সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে যোগ্য প্রার্থীকেই আপনার মূল্যবান ভোটটি দিন

একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার। তৃণমূলের ৯৫ শতাংশ নেতানেত্রী এবং তাদের দালালরা দুর্নীতিপরায়ণ। সাদা কথায় চোর ঘুষখোর। উন্নয়নের নামে বখরার উৎসব চলছে রাজ্যজুড়ে। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন জঙ্গলমহলে প্রথম দফায় ভোট চলছে। দিদি বলেছেন, জঙ্গলমহল হাসছে। জঙ্গলমহলের মানুষ হাসছেন কীনা জানি না। তবে সেখানের তৃণমূল নেতাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। উন্নয়নের টাকার বড় অংশ তাদের পেটে গেছে। কারণ, তারা ২ টাকা কিলো চালের ভাত খায় না। নোট খায়। মাত্র পাঁচ বছরে তৃণমূলের নেতারা জঙ্গলমহলে রীতিমত শহুরে কোটিপতি বড়লোক হয়েছে। গাড়ি বাড়ি সোনাদানা সবই হয়েছে। তাই জঙ্গলমহল নয়, জঙ্গলমহলের তৃণমূল নেতারা নিঃসন্দেহে হাসছেন। হতদরিদ্র মানুষ নয়।

সারদার পর নারদ স্টিং অপারেশনের গোপন ক্যামেরা দেখিয়েছে কত সহজভাবে তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা নোটের বান্ডিল নিচ্ছে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাত পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই শাসকদলটির নিচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত সকলেই উন্নয়নের নোট খায়। যে পাঁচ শতাংশ এখনও নোটের স্বাদ থেকে বঞ্চিত তাদের খুঁজে বের করা খুবই শক্ত। এক বস্তাপচা আলুর ভিতর দুটো চারটে ভাল আলু খুঁজে বার করা কি সম্ভব? খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে হয়রান হতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ তৃণমূল দলকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ চোরেদের দলে নিজের নাম লেখানো। ঘুষের কারবারিদের উৎসাহ দেওয়া। নারদের ভিডিও টেপ যে জাল নয় তা দলের সুপ্রিমো জানেন। তিনি জানেন যে তাঁর দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, কাউন্সিলার সকলেই ঘুষখোর। কিন্তু কিছু বলেন না। বাধা দিলে দলটাই উঠে যাবে। তাই নারদের ভিডিও নিয়ে তদন্ত তিনি করতে দেবেন না। দিদি জানেন যে ভিডিওটি আসল। সেখানে ববি হাকিম যে কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছে সেই ভাষাটা দিদির চেনা।

কলকাতার বুকে উড়ালপুল ভেঙে বহু লোক হতাহত হয়েছেন। এই উড়ালপুলের মালমশলা, শ্রমিক সরবরাহ করার দায়িত্বে ছিল এই এলাকায় (জোড়াসাঁকো) তৃণমূল প্রার্থী স্মিতা বক্সির দেওর তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা

গূঢ় পুরুষের কলম

রজত বক্সি। মমতার উন্নয়ন মানে উড়ালপুল আর শপিং মল। আর এই উন্নয়নের পিছনে আছে স্থানীয় তৃণমূলিদের কিছু পাইয়ে দেওয়া। বেটিংয়ের মতোই কাটমানির খেলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে দিদির চ্যালারা। খোঁজ নিয়ে দেখুন তৃণমূলের কাউন্সিলার বিধায়ক সাংসদদের ভাই ভাতিজা ভাগ্নে সবাই এখন ঠিকাদার। সবাই দিদির নির্দেশে উন্নয়ন করে বেড়াচ্ছে। রাজ্যজুড়ে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। বাইক বাহিনী দিয়ে এলাকা শাসন চলছে। ভারতমাতার জয় না বললেও চলবে। কিন্তু দিদির জয় না বললে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। স্তাবকতা দিদির বিশেষ পছন্দ। তাই তৃণমূল দলে আজ স্তাবকরাই সব কিছু চালায়।

তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার অর্থ চোরেদের সমর্থন করা। সারদা কেলেঙ্কারি এবং নারদের গোপন ক্যামেরা চোরেদের চেহারা চরিত্র, ভাষা সবই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। উড়ালপুলের ভেঙে পড়া দেখিয়েছে যে বক্সি পরিবার কীভাবে সেখানে উন্নয়ন করছিল। এরপর বক্সি পরিবারের প্রার্থীকে ভোট দিলে বিবেকের দংশনে ভুগতে হবে না? অথবা তারাই বিবেকের দংশনে ভুগবে না যারা চাইবে এলাকায় চুরির রাজত্ব চলুক। তোলাবাজি, খুন, ধর্ষণ এখন প্রতিদিনের গা সহা ঘটনা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহুরে মানুষের মনে কোনো প্রভাব পড়ে না। বড়জোর খবরের কাগজে পড়ে আমরা বিরক্তি প্রকাশ করি। প্রতিবাদ করার সাহস দেখাই না। এটা কিন্তু অরাজকতা দুর্নীতিকে একরকম প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বাঙালি একদা গর্ব করতো। আজ সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে নীরবে ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে যোগ্য প্রার্থীকেই আপনার মূল্যবান ভোটটি দিন। বোতাম টিপে জানিয়ে দিন চোরেদের সরকার আর নেই দরকার। গুণ্ডারাজ চলতে দেব না। রাজনীতির বিজ্ঞ চোরেদের সরকার আর নেই দরকার। গুণ্ডারাজ চলতে দেব না। রাজনীতির বিজ্ঞ পণ্ডিতরা বলছেন, দুর্নীতি নিয়ে বাঙালি ভোটাররা বিশেষ মাথা ঘামান না। মাথা ঘামালে গত লোকসভার নির্বাচনে সারদা কেলেঙ্কারি মমতার জয়যাত্রায় বড় ধাক্কা দিত। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা সারদা চিটফান্ড সংস্থা কমপক্ষে ১৫ লক্ষ গরিব মানুষকে প্রতারিত করেছে। কিন্তু লোকসভার ভোটের ফল দেখিয়েছে যে সারদা কেলেঙ্কারি যত গভীর হয়েছে ততই ভোট বেড়েছে শাসকদলের। অথচ দিল্লীতে এই দুর্নীতির ইস্যুতেই সরকার গড়েছে আপ। আমরা পারি না। বাঙালি হিসেবে এর জন্য আমি লজ্জিত।

তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘সারদা, নারদ, উড়ালপুল কেলেঙ্কারি ভোটের ইস্যুই নয়। রাজনীতির লোকেরা দুর্নীতি করে এমনই ধারণা আম জনতার। এত পার্টি যে ভোটে লড়ছে, দল চালাচ্ছে তার জন্য টাকা লাগেই। কেউ না কেউ এই টাকা দিচ্ছে। যারা দিচ্ছে তাদের নিশ্চয় কিছু স্বার্থ আছে। তার সঙ্গে ভোটের ইস্যুকে মিশিয়ে ফেললে হবে না।’’ আপনিও কি এই মতকে সমর্থন করেন? আপনিও কি চান যে উন্নয়নের আড়ালে শাসকদলের কাটমানির খেলা চলুক? প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়ার সহজ পথ ইভিএমের বোতাম। সেটাই দেবে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর। দুর্নীতির থেকেও সাইকেল, জুতো বা ক্লাবকে অনুদান ইত্যাদি প্রাপ্তি বড়। অথবা রাজ্যের মানুষের স্বার্থ বড়। বোতাম টিপে জবাব দিন। ▌

ভারতীয় জাতীয়তা

জাতীয় আত্মার উন্মোচন

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ঘরানার জাতীয়তার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাকে গুলিয়ে ফেলেননি। তাঁর চোখে পাশ্চাত্য জাতীয়তা ছিল ‘এক পৈশাচিক’ বিষয়।

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি এসে মনে হয় বুঝি ১৯৩০-এর দশকে ফিরে গেছি। মুসলমান জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের মতাদর্শ তুলে ধরে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। আর অন্যদিকে দলিত ও প্রান্তিক শ্রেণীর সামাজিক সুরক্ষার জন্য শোরগোল তোলা হয়। দুটি বিষয়েই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ইন্ধন জোগায়। আবার বাংলার মতো প্রদেশে মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নমঃশূদ্র রাজনীতির সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলে। পরিণতি কী হয়েছিল তা আমাদের সকলের কাছে সুবিদিত। ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ হলো আর ধর্মীয় মৌলবাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব বাংলাদেশের বেশিরভাগ তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষ পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ বছর আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু ১৯৭০-এর পর থেকেই ধর্মীয় রাজনীতি, জাতপাতের রাজনীতি ও আঞ্চলিক রাজনীতির উপর ভিত্তি করে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি মাথা তুলতে শুরু করে। কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপ সর্বনাশের রূপ নেয়। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো ভারত রাষ্ট্র আর জিগির তোলা হলো ‘আজাদি’র। সে জন্য আসুরিক শক্তির প্রলয় নাচন শুরু হয়। এর প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলি তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ (বর্তমানে বিজেপি) সামাজিক সমন্বয় ও শক্তিমান রাষ্ট্রের সমর্থক। জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারত সরকারের আপোশমুখী ও নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে সক্রিয় সদর্থক ও প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণ করার দাবি জানান। পাকিস্তান ও কাশ্মীর প্রশ্নে নেহরুর দোদুল্যমান মনোভাবের সমালোচনা করেন।

ভারতীয় জাতীয়তার স্বরূপ :

ভারতীয় জাতীয়তা নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। কোনো কোনো মহলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘আজাদি’র স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। এর মর্মকথা হলো ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে জাতীয়তার প্রতিফলন নয়, তা হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাচনের অধিকারের পরিপন্থী। আবার এমন যুক্তিও উঠে আসছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু এইসব সমালোচনা অর্থহীন প্রলাপের নামান্তর। জাতপাত ও ধর্মের রাজনীতির ব্যাপারীরা এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র বিরোধিতাই এখন জপমন্ত্র, একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। অথচ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আধার কী— সেই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে এদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আসলে বৃটিশ উদারনৈতিকবাদ, মার্কসীয় ধ্যান ধারণা আর ইসলামীয় ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তার ভাবোপলব্ধি সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ ও সর্বোপরি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সকলেই পাশ্চাত্য ঘরানার জাতীয়তার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাকে গুলিয়ে ফেলেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পাশ্চাত্য জাতীয়তা ছিল ‘এক পৈশাচিক’ বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতীয় জাতি কখনও সাম্রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করেনি। পরাক্রম ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না। স্বামীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন ‘ধর্মই আমাদের জীবনের রক্ত’। ‘তাই ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি করে তুলতে হবে।’ আর শ্রী অরবিন্দ ছিলেন রাজনৈতিক বেদান্তের প্রবক্তা। তাঁর মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোনো মতেই একটি দেশের অথবা জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় স্বদেশভূমিকে মাতৃভূমি বলে কল্পনা করা হয়। ‘বন্দেমাতরম্’ হয়ে উঠেছিল জাতীয় সংগ্রামের রণসঙ্গীত। ঔপনিবেশিক শাসনের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য উপনিবেশ-বিরোধিতা হয়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতীয়তার মূল ধ্রুবক।

ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও পণ্ডিতেরা ভারতকে কখনই একটি জাতীয় রাষ্ট্র বলে কল্পনা করেননি। তাঁদের মতে, ভারত একটি বহুজাতি অধ্যুষিত দেশ। ভারতে একাটি অখণ্ড জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে ভারতীয়রা ছিল কুসংস্কারগ্রস্ত ও হীনবল। তাই শক্তিমান বৃটিশরা সামরিক শক্তিতে

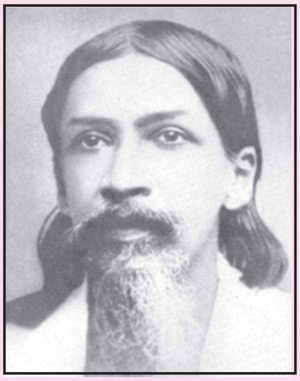

শ্রী অরবিন্দ ছিলেন রাজনৈতিক বেদান্তের প্রবক্তা। তাঁর মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোনো মতেই একটি দেশের অথবা জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

ভারতবাসীকে পদানত করে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। আলেকজান্ডার ডাও থেকে শুরু করে জেমস মিল, জন স্ট্র্যাচি (strachey) সকলেই ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন দুর্বল হীন জাতিগোষ্ঠীর ভূখণ্ড বলে চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্য মহলের ব্যাখ্যা হলো বৃটিশ যুগেই ভারতবর্ষ অখণ্ড রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য অর্জন করেছিল। একই ধরনের বিচার ব্যবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এবং রেলপথ ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ চরিত্র লাভ করেছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র হলো দ্বিমুখী। একদিকে সামরিক শক্তির সুবাদে ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষত বৃটেন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এ ছিল উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিণতি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের চরম স্ফীতি হয়। এই সময়েই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন on the origin of species & The Decent of Man গ্রন্থে যোগ্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মতাদর্শ তুলে ধরেন। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ডারউইনের মতবাদের আলোকে নিজেদের সাফল্য যাচাই করে। যোগ্যতম জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ফলেই এশিয়া ও আফ্রিকার নিকৃষ্ট জাতিদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছে। তাদের শাসনে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক প্রসারিত হবে এবং পদানত দেশগুলির মানুষেরা সভ্য ও উচ্চমান- সম্পন্ন হয়ে উঠবে। এই মানসিকতার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন পড়ে ভারতে বৃটিশ শাসকদের বাচন ও আচরণে। ভারতে বৃটিশ আইন সচিব লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে তাঁর প্রতিবেদনে প্রাচ্যের সভ্যতাকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বলে উপহাস করেছেন। তারও আগে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতীয়দের দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাই উন্নতমানের বৃটিশ আইন ও প্রশাসন এবং ইংরেজি ভাষা চাপানো হলো।

উপনিবেশবাদ যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বিরোধী প্রতিক্রিয়া হিসাবে পদানত দেশগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত বৃটিশ চিন্তাবিদ ভিক্টর কিয়েরনান তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে "The Lords of Human kind and Europian Attetudes to other cultures in the Imperial Age" (২০১৫ সংস্করণ, লন্ডন) দেখিয়েছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় দেশগুলি বীভৎস হিংসা ও নিপীড়ন চালিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বলবৎ করেছিল। অর্থনীতি ও রাজনীতির পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির ওপরেও আঘাত হেনেছিল। কিয়েরনান খোলাখুলি লিখেছেন ঔপনিবেশিক দাম্ভিকতার ফলে তারা বিদেশে আধিপত্য বলবৎ রাখার নৈতিক অধিকার হারিয়েছিল। মানবিকতার লঙ্ঘন পদানত দেশবাসীর মনে পাল্টা রোষানল সৃষ্টি করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর মনেই প্রথমে আত্মপরিচয়ের আকুতি ধ্বনিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে। 'স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এক নতুন বারতার পদধ্বনি। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ চেতনার স্পন্দন শোনালেন। তার আগে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মহারাণীর জয়গান' লিখতে কুণ্ঠিত হননি।

জাতীয়তার ভাবনাকে অনেকে আদর্শগত দিক থেকে বিচার করেছেন। জাতীয়তা আধুনিক ধর্মের অবয়ব ধারণ করেছে। জাতীয় সত্তার পরিস্ফুটন ঘটেছে জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনায়। এই মতের সমর্থক হলেন মার্কিন ঐতিহাসিক জে. এইচ. হেইজ। বিষয়টি অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন। তাঁর রচিত গ্রন্থ Imagined Communities : Reflections on the origin and spread of Nationalism (লন্ডন ১৯৮৩) গ্রন্থে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মনে জাতীয় আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবনার প্রসারে মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাহিত্য মানুষের মনে স্বাজাত্যবোধ গড়ে তোলে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে এমনটাই হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এরকম অভিব্যক্তি দেখা যায়। ভারতের পুরাতন ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে একটি পদানত দেশ তাদের অতীত গরিমা খুঁজে পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, অরবিন্দের ভবানী মন্দির, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রভৃতি রচনা অতীত ঐতিহ্য থেকে পদানত জনগোষ্ঠী আত্মানুসন্ধানের সুযোগ পায়। লোকমান্য তিলকের গণপতিপূজা ও শিবাজী উৎসব জনসংযোগের অস্ত্রে পরিণত হয়। এসবের মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতি অনুপ্রেরণা পায় এবং মুক্তি সাধনার ব্রতপালনে তারা উজ্জীবিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

'ভারতমাতা' চিত্র এই উদ্বেলিত দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যাত্রার মাধ্যমে বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাস গ্রামেগঞ্জে স্বাদেশিকতার ভাববন্যা সৃষ্টি করেন।

যদিও ভারতে জাতীয়তাবাদী ধারণার অন্তঃস্থল দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভাবধারায় আপ্লুত, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের আধুনিকতার মডেল যেমন গণতন্ত্র, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতিনীতি বর্জন করা হয়নি।

তাই স্বাধীনতার পর ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপিত হলেও এর আধার হলো ভারতীয়। 'সত্যমেব জয়তে' স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘোষিত আদর্শ। ধর্মচক্র প্রবর্তন ভারতীয় গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা। সম্প্রতি মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারতের স্বনির্ভর বিকাশের পন্থা ঘোষিত হয়েছে। ভারতের অখণ্ডতা ও স্বনির্ভরতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছে। জাতপাত ধর্মীয় বিভেদ সরিয়ে ফেলে সেনাবাহিনী মহাভারতীয় মহামিলনের মেলবন্ধন গড়ে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে ভারত সভ্যতার মর্মবাণী :

এখন প্রশ্ন হলো ভারতের ঐক্য ও সংহতি কি নিছক কৃত্রিম ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ''ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। রাষ্ট্রতন্ত্রে ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসি, ইংরাজ, জার্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।'' কিন্তু কেন ভারতীয় সভ্যতা সুমহান অতীত থেকে এখনও প্রবহমান? এর কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে প্রাচীনকালে 'গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। রাষ্ট্রশক্তির ক্ষয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীস ও রোমে প্রাচীন সভ্যতা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--- ''হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।' 'রবীন্দ্রনাথের মতে ''আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।'' বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ জানালেন ''আমার স্বদেশ আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা স্বদেশ''।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণা বিদ্যমান। সুপ্রাচীন অতীতে বিষ্ণুপুরাণে ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। আবার বিভিন্ন জনপদ নিয়ে অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ড শুরু হয় মৌর্যযুগে। কিন্তু অনেক সময় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাজনৈতিক অনৈক্য থাকলেও সর্বত্রই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল। পাল, চোল, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, বিজয়নগর সব রাজ্যেই ভারতীয় সস্কৃতির বন্ধন অটুট ছিল। তাই একদিকে যেমন অনেকে ভারতবর্ষে বিভেদের মধ্যে ঐক্য (unity in diversity) লক্ষ্য করেছেন, আবার ভাবগত ঐক্য স্তিমিত হয়নি। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর Fundamental unity in India গ্রন্থে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই জন্যই বুঝি সুলতানি যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তি আন্দোলনের সময় সমাজের প্রান্তিক মানুষের মনে ভক্তিবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মুঘল যুগে রাজপুত, মারাঠা, শিখ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এখন সময় আগতপ্রায় যখন ভারতের মৌলিক সভ্যতার ধারার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তিকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। শক হুন দল পাঠান মোগল একদেহে বিলীন হয়েছে, তাই সামাজিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে প্রগাঢ় করে তোলার অর্থ হলো ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যকে আঘাত করা। এই প্রচেষ্টা হলো সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতিকে নবকলেবরে প্রতিস্থাপন করা।

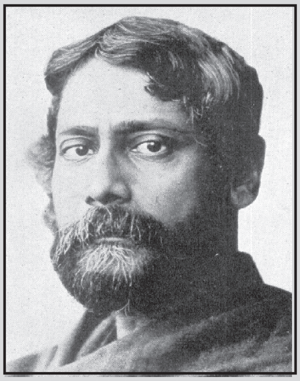

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ''হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।'

ভোগবাদী পাশ্চাত্য জগৎ এখন দিশেহারা, মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদী শক্তির রণহুঙ্কার সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাই ভারতে শক্ত সুদৃঢ় জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন শক্তির বিকাশ বিশ্বশান্তি ও সংহতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

(লেখক স্টেট আর্কাইভ-এর প্রাক্তন আধিকারিক)

ভারতীয় জাতীয়তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এন সি দে

জাতীয় স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর জাতীয়তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা একটি দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর ও কলঙ্কজনক। এটা ঠিক যে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই বিতর্কের অবতারণা করেছে; তা সত্ত্বেও আমাদের কোমলমতি ছাত্র ও যুবকেরা যাতে এর সহজ শিকারে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। এ দায়িত্ব পরে নয়, এই মুহূর্ত থেকেই গ্রহণ করতে হবে। অতীতের ঐতিহাসিক ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

কী সেই অতীত, কী সেই ইতিহাস, কিবা সেই ঐতিহাসিক ভুল; তা জানাটা জরুরি। ইতিহাস-সচেতন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই কোন্ কালে বলে গেছেন : "বর্তমান ভারতকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে অতীত যুগের যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক।" কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা তো মিথ্যা নয় যে আমাদের অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ জানতে হয় সেই দুষ্টমতি বিদেশিদের লেখা বিবরণ থেকে। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসকে 'নিশীথকালের দুঃস্বপ্ন' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন : "যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে দেশের ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা প্রথম স্থানে কৃত্রিম আলো ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।"

কিন্তু একথাও তো ঠিক যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি জ্ঞানীগুণী মানুষগণ পরমার্থ জ্ঞানার্জনে যত গুরুত্ব দিতেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার কাজে তত গুরুত্ব দিতেন না। তাই যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "আমরা অকালের ধ্যানে এত মগ্ন যে কালের গতির প্রতি দৃষ্টিই রাখি না। এই বৈদান্তিক জাতির নিকট মানুষের পার্থিব জীবন যেন একটা সরাইখানা। ...এ সংসারে কি ঘটিল, কে কি করিল, তাহার বিবরণ রক্ষা করা, এমনকী তাহার দিকে মন দেওয়াও অমূল্য মানব জীবনের অপব্যয় মাত্র, নিজ চরম সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া।" এমন একটি অবাস্তব নিশ্চিন্ত জীবনে অভ্যস্ত মানবগোষ্ঠীর সমাজকে কলুষিত করতে সুচতুর ইংরেজদের বেশি সময় লাগেনি। তারা এদেশে এসেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এদেশের মাটিতে চিরস্থায়ী করার কাজে লেগে পড়ল। মেকলেকে এ কাজে নিয়োগ করা হলো। মেকলে ভারত ভ্রমণ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি, তা জানলেই বোঝা যাবে আজকের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জাতীয়তার প্রতি ঔদাসীন্যের কারণ। এই রিপোর্টে মেকলে বলেছিলেন, 'এমন মানবিক অমূল্য সম্পদ এদেশে বর্তমান, এমনই উচ্চ এদেশের নৈতিক অবস্থা, এই ধরনের মূল্যবান মনুষ্যজীবন এবং এদেশের উচ্চ আদর্শ, এদেশের মানুষের মানসিক উৎকর্ষ ও ধর্মজীবনের প্রতি এদের প্রীতি— এসব দেখে আমার মনে হয়েছে আমরা কোনোদিনও এদেশকে জয় করতে পারব না যদি না এদেশের মেরুদণ্ডটাকে ভাঙতে পারি।' সেই শুরু। আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙার খেলায় এই কাজে তিনি তুরুপের তাস করেছিলেন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে। বৃটিশ সরকারের কাছে তাই তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন, 'এদের অনেক দিনের গড়া শিক্ষার অবয়বকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে হবে। এমন একটি ভাবকে এদের মধ্যে এনে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের মূল্যবান সংস্কৃতিকে, শিক্ষাকে হেয় জ্ঞান করতে পারে।' এইভাবেই মেকলে এদেশে একদিন তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যারা তাঁর মতে, 'আমরা যেমনভাবে ওদের চালাতে চাইব ওরা সেইভাবেই চলবে, ওদের ওপর আমাদের আধিপত্য তখন চিরস্থায়ী হবে।' (ভাষান্তর 'উদ্বোধন' ফাল্গুন, ১৪২০ সংখ্যা)।

> **"বর্তমান ভারতকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে অতীত যুগের যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা তো মিথ্যা নয় যে আমাদের অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ জানতে হয় সেই দুষ্টমতি বিদেশিদের লেখা বিবরণ থেকে।"**

ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষিত যুবক- যুবতীদের মধ্যে ঘৃণা জাগ্রত করার মেকলীয় ষড়যন্ত্রের সেই শুরু। ডিরোজিওর এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদালতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" এই উক্তিটির মধ্যে যুক্তি যতটা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা। ইংরেজি শিক্ষার কুফল দেশীয় যুবক-যুবতীদের মধ্যে এক নতুন মোহাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। যদিও ডিরোজিও রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহায়তায় গড়ে তোলেন জাতীয় মেলা বা চৈত্র মেলা ১৮৬৭'-র ১২ এপ্রিল। পরে এর নাম হয় 'হিন্দু মেলা'। কিন্তু এই মেলার উদ্যোক্তারাও কিন্তু মেকলীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে,

''রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণ বাবুই বল, তাহাদের Patriotism-এর বারো আনা বিলাতি, চার আনা দেশি, ইংরেজ যেমন Patriot, আমিও সেইরকম Patriot হব— এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল।'' এর উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, 'মেলায় গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি ব্রিটানীয়ার (সম্ভবত ইংরেজ সম্রাজ্ঞী) সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে।' তাঁর মতে জাতীয় মেলার উদ্যোক্তা স্বয়ং নবগোপাল মিত্রের ঝোঁক ছিল, বড় ইংরেজকে নিমন্ত্রণ করা।

এই ঝোঁকের পরিবর্তন পরবর্তী হিন্দু মেলার অধিবেশনগুলিতে করা হলেও চতুর ইংরেজ তা দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি। সেই সময় ইংরেজদের কারসাজিতে পরপর তিনটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। ১৮৭৫ সালে জন্ম নেয় 'ইন্ডিয়ালীগ'; ১৮৭৬ সালে জন্ম নেয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' আর তারপরেই জন্ম নেয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। নব্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় রাজনৈতিক উদ্দীপনায়। অতএব হিন্দুমেলার অবনতি হলো। কারণ হিন্দুমেলার সঙ্গে দেশের মাটির যেটুকু যোগ ছিল, এইসব রাজনৈতিক সংগঠনে তার ছিঁটেফোটাও ছিল না। এদের কাঠামো ছিল অনেক পরিমানেই বিদেশি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ইতিহাসের অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্তর মতে, 'সে যুগের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের অনেকের দৃষ্টি দূর সিন্ধুতীরে নিবদ্ধ ছিল এবং আচরণে ও মানসিকতায় তাঁরা দেশবাসীর প্রতীক ছিলেন না।'' জওহরলাল নেহরু তার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ। তিনিই হয়েছিলেন এদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাই তাঁর ধারনা মতো এদেশের জাতীয়তার ভিত্তি কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, জাতীয়তা বলতে আমরা যা বুঝি তা এদেশে মধ্যযুগে তো বটেই, প্রাচীন যুগেও দুর্বোধ্য ছিল। আর আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত অজানাই ছিল। প্রাচীন যুগে হিন্দু রাজাদের কাণ্ডকারখানা দেখলে তো বেশ অবাকই হতে হয়। রাজা প্রতাপাদিত্যের সভায় খৃষ্টান পাদরি সাহেব তাঁর কাছে একটা বড় জায়গা চেয়ে বললেন, ''যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস করাইলে তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য করিতে এবং ধর্মপথে রাখিতে পারিব। তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বন্ধে একখান ফরমান প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে, ওই বাড়িতে যেসব হিন্দু (অর্থাৎ নূতন খৃষ্টানেরা) বাস করিবে তাহারা যা (কর) দিত তাহা আমাদিগকে দিবে।'' এখানে একটি পাথরের গীর্জা নির্মাণ করার অনুমতিও দিলেন, ভাবুন একবার সেই যুগের হিন্দু রাজাদের জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার দৈন্যের কথা।

ভারতীয় জাতীয়তা সম্পর্কে এইরকম অদ্ভুত দীনতার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের আচরণে যুগ যুগ ধরে। আমরা এখনও উত্তর ভারতের মানুষজনকে বলি 'হিন্দুস্থানী', যেন আমরাই এই হিন্দুস্থানে বিদেশি। মারাঠাদের বর্গী দস্যু বলি। মুসলমান ও ইংরেজদের হাতে দেশিয় মারাঠাদের পরাজয়ে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম। আমরাই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে পাঞ্জাবি, হিন্দুস্থানী, অসমীয়া, ওড়িশা, মারাঠী, মাদ্রাজী ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে থাকি। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ধারণা ছিল খুবই ক্ষীণ। একদিকে হিন্দুদের মধ্যকার বৈষম্য; অন্যদিকে হিন্দুস্থানে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অভ্যুদয়, যারা হিন্দুদের ঢিলেঢালা জাতীয় চেতনার সুযোগ নিয়ে ক্রমশই ধর্মান্তরের মাধ্যমে নিজেদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলল। মুসলমান জনগোষ্ঠী কোনোদিনই এদেশের জাতীয়তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। সুযোগ বুঝে এদের নেতা প্রথমে মহম্মদ ইকবাল, পরে জিন্না মুসলমানদের জন্য নিজস্ব হোমল্যান্ড দাবি করল। এই কাজে তারা কাজে লাগায় হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যকে। চতুর ইংরেজের সহায়তায় মুসলমান নেতারা হিন্দু বর্ণবৈষম্যকে কাজে লাগাতে নমঃশূদ্র যোগেন মণ্ডলদের মাঠে নামালেন। আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডলরা বলতে শুরু করল : ''তপশিলিরা হিন্দু নয়। মুসলমানদের মতোই অহিন্দু। তারা এক পৃথক জাতি'। যোগেন মণ্ডলরা সেদিন এমনকী পাকিস্তান গঠনের পক্ষেও ধুয়ো তুলেছিলেন। সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলায় যে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল তাতেও যোগেন মণ্ডল মন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই সরকারের মদতে একদিকে মুসলমানরা হাতে ছুরি নিয়ে রাস্তায় নামল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। আর অন্যদিকে যোগেন মণ্ডলরা পাকিস্তানের পক্ষে ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে মাঠে নেমে পড়ল। বলতে শুরু করল, ''ওই দাঙ্গা বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বিরুদ্ধে, তপশিলিদের বিরুদ্ধে নয়।''

হিন্দুদের মধ্যে এই বর্ণ-বিদ্বেষ সেদিন গোটা হিন্দু সমাজের কী মারাত্মক ক্ষতি করেছিল তা আজ ইতিহাস। সেই ইতিহাস থেকে, কী উচ্চবর্ণীয় কী নিম্নবর্ণীয়— কেউই কোনো শিক্ষা নেয়নি। যদি নিত তাহলে আজ পুনরায় সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের উসকানিতে রোহিত ভেমুলার ও কানহাইয়ার মতো উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ররা উমর খালিদদের নিয়ে মুসলমান সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসিকে শহিদ দিবস হিসাবে পালন করতে পারত না। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার দালালি করতে পারত না। কোমলমতি ছাত্রগণ যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিত তাহলে তারা জানতে পারত, আগ্রাসী ইসলামের হাতে যোগেন মণ্ডলের কী পরিণতি হয়েছিল। এই হিন্দুস্থান না থাকলে সেদিন যোগেন মণ্ডল কোথায় আশ্রয় পেত? ইতিহাস থেকে যদি ছাত্ররা শিক্ষা নিত, তাহলে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের সম্পর্কের কথাও জানতে পারত। একথাও তারা জানতে পারত দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী এই কমিউনিস্টরা। বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য রজনীপাম দত্তের কাজই ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্র-যুবাদের কমিউনিস্ট বানিয়ে ভারতে প্রেরণ করা যাতে তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে পারে। তাঁর নিজের লেখা 'দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল ডকট্রিন অফ কমিউনিজম' বইটিতে ১৯৩৮ সালে তিনি লিখেছিলেন : ''আজ থেকে একশো বছর আগে কবি হাইনে, যিনি সাম্যবাদকে সমর্থন করতেন, আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে সামাজিক ন্যায়ের জন্য সাম্যবাদ প্রয়োজনীয় হলেও মানবীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তা বিপন্ন করে তুলতে পারে।''

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে, ভারতীয় জাতীয়তার এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি জানা জরুরি বলেই মনে করছি। ■

ভারতমাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কমিউনিস্টরা

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

যুক্তির ঘাটতি তামাসা বা মিথ্যাচার বলেই মনে হচ্ছে। যারা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাবরমতি ধাবা'-য় কবি সম্মেলন করবে বলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিল--- 'ডাকঘর ছাড়া দেশ'— Country without Post Office শিরোনামের সেই কবি সম্মেলন হবার কথা ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। হঠাৎ সেই অনুষ্ঠানে শুরু হলো আফজল গুরুর ফাঁসির তৃতীয় বার্ষিক উদ্‌যাপন! কমিউনিস্ট আদর্শের মূল দলিল কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে জ্বলজ্বল করে লেখা আছে— নিজেদের মতামত ও লক্ষ্য গোপন করতে কমিউনিস্টরা লজ্জাবোধ করে। লেনিন বলেছিলেন— তাদের বিপ্লব কোনো গোপন ষড়যন্ত্র নয়, তা হলো ঘোষিত যুদ্ধ। সেই মতাদর্শের নতুন প্রজন্মের সমর্থকদের হলো কী? তারা এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে মতামত ও লক্ষ্যকে মিথ্যাচারের রঙিন মোড়কে ঢেকে রাখছে কেন?

৯ ফেব্রুয়ারি 'সাবরমতি ধাবা'য় আওয়াজ উঠেছিল--- 'কাশ্মীরের আজাদি' চাই, সেই লক্ষ্যে ভারতবর্ষের 'বরবাদি' হয় হোক— কোনো ক্ষতি নেই। আওয়াজ তুলেছিল যারা তারা এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নিয়ম ভাঙল তাও নয়— এর আগে কয়েক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে ছাত্রাবাসে 'অতিথি' হিসাবে থাকার দয়া ভিক্ষা করেছে তারা! বোঝাই যায় ডোরাকাটা চামড়া তাদের--- আলো ছায়ায় আত্মগোপন করার কৌশল। বস্তুত কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের পক্ষে পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় এছাড়া আর কীই বা করা সম্ভব! সি রাজা বা সীতারাম ইয়েচুরিদের দেখে করুণাই জাগে। সারা দেশে যারা ক্রমাগত নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে— আন্তর্জাতিক পরিসর কমে এসেছে— রাশিয়া ভেঙে ছত্রখান, চীনে হান-জনগোষ্ঠীর নির্মম নিষ্ঠুর আধিপত্যবাদ আর খেলনা ধনতন্ত্র, ভেনেজুয়েলা— সোমালিয়ায় টিঁকে থাকার কিঞ্চিৎ ছটফটানি, কিংবা ভিয়েতনাম-উত্তর কোরিয়ায় জঙ্গি জাতীয়তাবাদ কিংবা মার্কিনদের পদলেহন— একে তো আর সাম্যবাদ মায় সমাজতন্ত্র বলে চালানো যাবে না। ফলে দেশবিরোধী শক্তি সমাবেশ, সন্ত্রাস ও বিভাজনপন্থীদের তোল্লাই দেওয়াটাই তারা প্রগতিশীলতা বলে জাহির করার পথ খুঁজছে। এতে বাম রাজনীতির দেউলিয়াপনা ছাড়া অন্য কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না।

বছর কয়েক আগে অরুণাচলকে বিতর্কিত অঞ্চল বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রকাশ কারাত। তিব্বতী উদ্বাস্তুদের সহায়তা করা, বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাইলামাকে আশ্রয় দেওয়া তাদের দীর্ঘদিনের না-পসন্দ ব্যাপার। এখন জুটেছে কাশ্মীর সম্পর্কে মানবাধিকারকে গুলিয়ে ফেলার কাণ্ড কারখানা। কাশ্মীর বলতে এরা কেবল শ্রীনগর-উপত্যকা আর সুন্নি মুসলমানদেরই বোঝেন। কাশ্মীরের 'পণ্ডিত'-সমাজ এদের দৃষ্টি সীমার বাইরে থেকে যায়। কেন, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংখ্যা কম বলে? তাদের কোনো মানবাধিকার থাকতে নেই? জম্মু উপত্যকার হিন্দু আর লে-লাদাখের বৌদ্ধদের বাদ দিয়ে কাশ্মীরের আজাদি আসলে ধান্দাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।

জে-এন-ইউ-এর গবেষক কানহাইয়া কুমার কদিন আগে একটি দূরদর্শন সাক্ষাৎকারে বলেছে--- আফজল গুরু একজন 'অখণ্ড ভারতের নাগরিক'; কাশ্মীরের নাগরিক। এ থেকে তার মনটা জলের মতো পরিষ্কার বোঝা যায়। অর্থাৎ খণ্ডিত ভারতে কাশ্মীর একটি স্বতন্ত্র— বিতর্কিত অঞ্চল। একথা যদি দেশদ্রোহ না হয় দেশদ্রোহ তাহলে কাকে বলে? আজ কানহাইয়া বলছেন— কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই যদি হবে তাহলে ৯ ফেব্রুয়ারির সভাটি কি মায়া ছিল? চালাকি আর মিথ্যাচার দিয়ে কোন সাফল্য পেতে চাইছেন সীতা-রাজার দল?

ওয়ারিস পাঠান আর এ আই এম আই এম নেতা ওয়াইসি প্রকাশ্যে বলছেন তাদের গলায় ছুরি চালালেও তাঁরা ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি দেবেন না। বিশিষ্ট উর্দু কবি জাভেদ আখতার আর অভিনেত্রী শাবানা আজমি এর প্রতিবাদ করেছেন। ভালো কথা। শাবানা তো জিজ্ঞাসা করেছেন— ওয়াইসি পাঠান বা ওয়াইসি-দের আপত্তিটা কোথায়? ভারতের বিপক্ষে না মা-য়ের সম্পর্কে তারা আওয়াজ তুলতে চান? বিতর্কটি আজকের নয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় ‘বন্দেমাতরম্’ বলতে চায়নি মুসলমান সমাজের গোঁড়া অংশ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ গড়ে ওঠার পর এই আপত্তি তীব্র হয়েছে। একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে পদ্মফুল আছে বলে আপত্তি তুলেছিলেন মুসলমান নেতৃবৃন্দ। সেই ধারা আজও অব্যাহত। দেশকে মা বলতে যাদের লজ্জা তারা কোন স্তরের জীব ভাবতেই হচ্ছে।

যে বাংলা দেশ বিভাগের জঘন্যতম বলি সেই বাংলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিরোধী আওয়াজ উঠছে! মনে থাকছে না বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ গঠনের মধ্য দিয়ে ঋষি অরবিন্দ- রবীন্দ্রনাথ-বিনয় সরকার-ত্রিগুণা সেনদের উত্তরাধিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ঐতিহ্যচ্যুত বিপথগামী একদল ছাত্রছাত্রী কখনো কলরব, কখনো চুম্বন, কখনো স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে বাজার গরম করতে নেমেছে। বাম আমলে অনিল বিশ্বাসী আনুগত্যের জোরে যারা অধ্যাপক হয়েছেন— তাঁরা এই সব ছাত্রদের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন! রাজা- সীতরামদের মতো ভাবের ঘরে চুরি করে যাচ্ছেন। ক্রমেই ফেঁসে যাচ্ছে যবনিকা— বেরিয়ে আসছে মুসলমানি দেশবিরোধী শক্তি আর কমিউনিস্ট চালবাজির মুখোশের আড়ালে মুখ। এরাই একদা আমাদের আজাদিকে ঝুটা বলেছিল! মুসলমানদের সঙ্গে মাখামাখি না করলে কমিউনিস্টদের চলে না। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরির ইতিহাস তো তারই সংবাদ বহন করে। খিলাফত আন্দোলন করতে যাওয়া মুসলমান আন্তর্জাতিকতাবাদীদের তাসখন্দে যাত্রা আর সেখানে বসে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরির কথা ভুলে গেলে চলবে না। ছিল বেড়াল হলো রুমাল। ছিল কংগ্রেস-সমর্থিত খিলাফত, হলো রাশিয়া-সমর্থিত কমিউনিস্ট! এরা আমাদের দেশের পক্ষে কত বিপজ্জনক তা বোঝার জন্য ইতিহাস ঘাঁটার দরকার নেই।

“ভারত ভাঙতে মুসলমানরা হাজার বছর চেষ্টা করেছে— এখন নতুন একদল রাজনৈতিক মুসলমান কাজটি শুরু করেছে। তাদের আওয়াজ এখন কাশ্মীরের আজাদি আর ভারতবর্ষের বরবাদির জন্য। আর ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি তাদের না-পসন্দ।”

একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা লিখব। এক বিচিত্র পরিচয়ের দাবিদার গাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে শহরে বসেছিল আসর। সেখানে এই তৃণমূল-সাংসদ (দলের সঙ্গে ঝগড়া করেও যিনি পদত্যাগ করেননি!) উপস্থিত মানুষকে বললেন, তিনি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘু— মুসলমান। ‘রাজনৈতিক মুসলমান’! পলিটিক্যাল মুসলিম। ঝুলি থেকে বেড়াল বেরুল আর কি। পাদরি স্টেইন-কে হত্যা করার প্রতিবাদে তিনি ধর্মত্যাগ করেছিলেন। আশ্চর্য কথা— খৃষ্টান হননি! বনেছেন রাজনৈতিক মুসলমান! উদ্দেশ্যটি এতদিনে খোলসা হলো। ভারত ভাঙতে মুসলমানরা হাজার বছর চেষ্টা করেছে— এখন নতুন একদল রাজনৈতিক মুসলমান কাজটি শুরু করেছে। তাদের আওয়াজ এখন কাশ্মীরের আজাদি আর ভারতবর্ষের বরবাদির জন্য। আর ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি তাদের না-পসন্দ। এরা তৃণমূল ঘরানায় হিজাব পরবেন, না ওই বিচিত্র গায়কের মতো কুরুশবোনা টুপি? নাকি তারা ওমর খালিদ-কানহাইয়ারাম বা অনির্বাণের মতো মিথ্যাবাদী হবেন— সময় বিচার করবে। তবে আশার কথা— এই দেশে শাবানা আজমি-জাভেদ আখতাররাও আছেন। সবাই রাজনৈতিক ধান্ধাবাজ ও মাতৃভূমির ঘোষিত বা আড়াল-শত্রু নন।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

167, Netaji Subhas Road
Rajakatra, Kolkata - 700 007
Phone : 2258-0042 / 43 / 44
Fax : 2258-0014

DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

উনিশ শতকের বাংলার পত্র-পত্রিকা ও হিন্দু জাগরণ

সত্যনারায়ণ মজুমদার

ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস পর্যালোচনার নির্যাস হলো যে পরাধীনতাকে এদেশের সমাজ স্বীকার করেনি, ফলে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ। অপরদিকে সমাজ জাগরণের ধারাকে রেখেছিল অব্যাহত। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী রাজা, জমিদার, অত্যাচারিত উপজাতি সম্প্রদায় ও নিরন্ন কৃষক শ্রেণী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, কিন্তু এই সময়েই এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষিত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁরা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে সে সময়ের পাশ্চাত্য আর্থ-সামাজিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞানের নতুন আলোকে আয়ত্ত করেছিলেন সমালোচনামূলক এক চিন্তাপদ্ধতি এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের দুর্ভাগ্যের কারণ কেবল বৃটিশরাই নয়। এর মূলে রয়েছে ভারতের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, দীর্ঘকাল মুসলমানদের শাসনে থেকে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেছে কুসংস্কার— যার পরিবর্তন একান্ত দরকার এবং এর জন্য প্রয়োজন হিন্দু জাতির গৌরবময় দিককে তুলে ধরে জাতিকে উদ্দীপ্ত করা। পরবর্তীতে ভারতকে এক জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই ধারাটিই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই স্রোত-প্রবাহিত রাজনীতির যোগ ছিল না বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রবাহ ব্যাপকভাবে গণভিত্তিক হলেও এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁদের সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও এই প্রথম ভাগের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে সেই আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়নি।

শিক্ষিত মনের আয়না হলো সংবাদপত্র। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভিত্তিক জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার মূল খুঁজতে হবে পত্রপত্রিকার ইতিহাসে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হিকি সর্বপ্রথম ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে 'বেঙ্গল গেজেড' প্রকাশ করেন। ১৭৮০ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে ৬টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ সালের পূর্বে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ১৮২২ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রের ভূমিকাকে ইংরেজরা রাজদ্রোহ ও বিক্ষোভের প্রতিষেধক মনে করলেও পরাধীন দেশে এহেন স্বাধীনতার মানসিকতা যে শাসনের বিপদ ঘটাতে সক্ষম হতে পারে এহেন চিন্তা করেই ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ ইংরেজ শাসন 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' জারি করে ঘোষণা করে যে গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ও যথোচিত লাইসেন্স ব্যতীত সংবাদ পত্রের প্রকাশন সম্ভব নয়। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রথম রাজা রামমোহন রায় প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন যাতে সহযোগিতা করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি। বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা এই আন্দোলন বৃহত্তর রূপ ধারণ করলে ১৮৩৩ সালে মেটকাফ্ এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করেন এবং ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৭৮ সালে ইংরেজ শাসক পুনরায় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়, ফলে ইংরেজ সরকার হার মানতে বাধ্য হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিতে সাহিত্যিক আদর্শ তেমনভাবে গড়ে না উঠলেও সেদিনের চিন্তাধারার ফসল এই পত্রিকাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮২৯ সালের ১০ মে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদূত' যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবনার প্রতিফলন এই পত্রিকাতে ঘটেছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে ইংরেজদের মন্তব্য ছিল— "A native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character will be subjoined lent distinct and under the superintendance of the

most talented Hindoos." বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন সুপণ্ডিত নীলরতন হালদার, পরে এর দায়িত্ব নেন ভোলানাথ সেন। গৌড় রাজ্যের অতীত শ্রী'র বর্ণনা ও তার বিলুপ্তি বিষয়ে প্রচার করে স্বরাজ্যের এক নবচেতনার সূচনা পত্রিকাটি করেছিল।

১৮৩১ সালের ১৮ জুন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানান্বেষণ' যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, কৃষ্ণমল্লিক এবং রামগোপাল ঘোষ। একদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত জ্ঞানের বিস্তার যেমন পত্রিকাটি করেছিল তেমনি অন্যদিকে হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতার বিষয় উল্লেখ করে ধর্মীয় আচারসর্বস্বতার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল পত্রিকাটি। পূজা পার্বণে নাচ গান ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধেও পত্রিকাতে প্রখর সমালোচনা করা হয়— ''নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে--- তাহা ভারতবর্ষীয় লোকদের বিদ্যা শিক্ষার্থে ব্যয় করুন, এ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা শিল্পযন্ত্র এবং দেশের চাষ বৃদ্ধি করুন।" পত্রিকাটির বহু প্রবন্ধে নারী শিক্ষা ও তাদের স্বাধীনতা ও বিকাশ বিষয়ে সমাজকে সচেতন করা হয়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলেও তাদের পত্রিকাতেই পরোক্ষে হিন্দুধর্মের সংস্কারের ধারাকে বজায় রেখেছিল।

১৮৪২-এ প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। পত্রিকা প্রকাশকালীন সময়ে কলকাতায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

রামমোহনের নেতৃত্বে এই সময় শুরু হয়েছিল হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন যার মাধ্যম ছিল মানবতা, যুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ। অন্যদিকে এহেন কুপ্রথার হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য ধর্মসভা নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যার অগ্রণী ছিলেন রাধাকান্তদেব ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দেশীয় পণ্ডিতবর্গ। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য গৌরবের আধারে তাঁরা ইউরোপীয় আগ্রাসী চিন্তাধারাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বেঙ্গল স্পেকটেটর এই দুই ধরনের মতকেই প্রকাশ করতো— ''সামাজিক সুখ ও জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে মেলবন্ধন না ঘটালে হিন্দুধর্মের পতন অবশ্যম্ভাবী।" ধর্মসংস্কার না করলে হিন্দু জাতিই বিপথে পরিচালিত হবে বুঝে পত্রিকাতে লেখা হয়েছে— ''বর্তমানে প্রচলিত আচারসর্বস্ব বিধান হলো বৈদিক চিন্তাধারার সম্পর্কে সামঞ্জস্যহীনতা।" কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহ পদ্ধতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এই পত্রিকা।

হিন্দুসমাজের সংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ঘটনায় বাঙালির পুরনো আদর্শ যখন ভেঙে যাচ্ছিল তখন মিশনারি সাহেব মার্শম্যানের পরিচালনায় আবির্ভূত হয় সমাচার দর্শন যা হলো যুগপ্রবাহের নীরব সাক্ষী। যদিও পত্রিকাটি সাহিত্যাদর্শ বা সমাজের গঠনমূলক আদর্শ উপস্থাপন করতে পারেনি তবুও পত্রিকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সমস্ত প্রকারের লেখালেখিই প্রচার করা হোত।

হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার জন্য এই সময় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন সমাচার চন্দ্রিকা। পত্রিকাটি ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। হিন্দুসমাজের উপর বিভিন্ন প্রকার আক্রমণের প্রতিবাদ পত্রিকাটির মাধ্যমে করা হোত। 'বাবুর উপাখ্যান' নামে একটি নকশা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। ধর্মসভাপন্থী ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকর। ডিরোজিওর শিষ্যরা যখন কলকাতায় শিক্ষিত যুবকদের হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করছিল তখন তার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের সপক্ষে ঈশ্বরগুপ্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রচার করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও হিন্দু ফিলানথ্রপিক সভার সদস্য হওয়ার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত হিন্দুধর্মের উদারতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ধর্মের এই মহানতা ও উদারতার দিকগুলো তিনি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেন। ঊনিশ শতকের নবজাগরণের কালে বাংলার সমাজের যে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটেছিল সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠার মধ্য দিয়েই তা সূচিত হয় হিন্দুধর্মের উদারতা ও পরিশীলতার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরগুপ্তই সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের বিরাট পরিধিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র রঙ্গলাল ও মনোমোহন বসুর ন্যায় লেখকদেরকে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রথম প্রকাশ ঘটলো ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বিচার ধারার বিকাশ— ''ইহার আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম।" এই পত্রিকায় যুগন্ধর ধর্মের বিষয়ে দুরূহ প্রবন্ধ লেখা হোত। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ধর্মের প্রবন্ধেই যে পত্রিকা সীমিত ছিল তাতে যুক্ত হলো হিন্দুসমাজের সংস্কারমূলক প্রবন্ধ। দেশপ্রেমের জাগরণে লেখা হলো--- ''আধুনিক চিন্তাধারায় দেশপ্রেমিক মনোভাবে জাতিকে জাগ্রত করতে হবে— তাই কাজ করতে হবে মধ্যবিত্তদেরই। অতএব হে স্বদেশীয় বান্ধবগণ আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। তোমরা নিরুৎসাহ নিদ্রা হইতে উত্থান কর এবং জ্ঞানের আলোক দ্বারা স্ববাসের মঙ্গল অনুসন্ধান কর।"

ভারতকে জাগ্রত করতে হবে অতীতের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে। জাতিকে উদ্দীপ্ত করে পত্রিকা বলেছে— ''যে ক্ষত্রিয় বীর্য্য কোথায় লুপ্ত হইল? হিন্দুরাজ্য স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল।"

এই পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বদেশীভাব, ভাবনা ও আচরণে উৎসাহ দেবার জন্য A Society for the promotion of National feeling among the educated nation of Bengal নামে একটি সমিতি গঠিত হয় যার প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র প্রকাশ করেন 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একটি পত্রিকা। আধুনিকতার সঙ্গে দেশীয় ভাবধারায় ও ঐতিহ্যকে খাপ খাইয়ে নিয়ে স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি দিয়ে নবভারত গঠনই যার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিশ মুখার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো হিন্দু পেট্রিয়ট। নীল চাষীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পৃহাকে তীব্রভাবে জাগ্রত করেছিল এই পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রভাব এতটাই ছিল যে স্বয়ং বড়লাট হিন্দু পেট্রিয়টের প্রতিটি সংখ্যা কিনতেন। নীলবিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহের পরেই ভারতকে

শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই পরাধীন সমাজে স্বাধীনতা প্রতি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেল। হিন্দু পেট্রিয়ট এই যুগের মনোভাবনাকে প্রতিফলিত করেছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতার মূল্যবোধের ফসল রক্ষার জন্য হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে যেমন সমর্থন করেছে তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমাজমুখী করে দেশের কর্মযজ্ঞ ও রাষ্ট্রীয় চিন্তায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছে। এই জাগরণ কাজের সময়ই আর একটি সাময়িক পত্রিকার জন্ম হয় যার নাম সোমপ্রকাশ, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর যার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রচার করে এই পত্রিকা যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। সোমপ্রকাশের এই উদ্দেশ্যের ধারাকে উগ্রগতি দান করেন শিশির কুমার ঘোষ তাঁর অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় নবজলোদগমের মতো চঞ্চল ও চমকিত করে আবির্ভূত হলো বঙ্গদর্শন। 'বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা, ইতিহাসপ্রীতি, স্বদেশানুরাগ এবং হিন্দুধর্মের উদারতা ও গদ্যে স্পষ্টতা ছিল বঙ্গদর্শনের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র এর মাধ্যমেই ধর্মকে দেশাত্মবোধে এবং দেশপ্রেমকে ধর্মবোধে পরিণত করলেন— ''Bankim Chandra Converted religion into patriotism and patriotism into Religion.'' বঙ্গদর্শনে প্রচারিত কবিতায় হিন্দু জাতির ক্ষয়িষ্ণুরূপের বিরুদ্ধে জাতিকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। 'ভারতভূমি' কবিতাটি তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। জীবনের ন্যায় জাতির জীবন ও অস্মিতা নির্ভর এই আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধানে ছিল বঙ্গদর্শন। আর্য জাতির আদিম অবস্থা, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ, ভারতকালে ভেরী বাজিল, শিবাজী, ভারতভূমির অভ্যর্থনা, প্রাচীন ভারতবর্ষ— এই রকম বহু প্রবন্ধে হিন্দুগৌরব কাহিনির বিবরণ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বেদনা ব্যক্ত হয়েছে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বঙ্গদর্শন এর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে বেঁধে দেবার স্বপ্ন নিয়ে সেইজন্য হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা ও ভারতের ঐক্য নির্মাতা রূপে উপস্থাপিত করে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হলো 'কৃষ্ণচরিত্র'। ১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র দিলেন জাতির উদ্দেশে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। ১৮৮২-তে প্রকাশিত হলো 'আনন্দমঠ'।

সম্পূর্ণ ঊনিশ শতক ব্যাপী ভারতবিদগণ এদেশের সুপ্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লববাদী ও চরমপন্থীগণ তার উপরে উঠে দেশমাতাকে জগজ্জননীর আসনে বসালেন। পশ্চিমী সভ্যতার অঙ্কে যে জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছিল তাকে ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করতে হিন্দুধর্মের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই বলে তাঁরা মনে করতেন। এদেশের মানুষ চিরকাল একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে তাদের সাধারণ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেছে। এই সচেতনতাকে সক্রিয় করে সম্প্রদায় ধারণা থেকে তাকে জাতীয় ধারণাস্তরে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন ছিল হিন্দু ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবন। তিলক লিখেছিলেন ১৮৯৬ সালে 'মারাঠা' পত্রিকাতে ''হিন্দুত্বই ভারতীয় সমাজের সাধারণ ধর্ম... কিন্তু হিন্দুত্ব শুধু উচ্চ শিক্ষিতদেরই আকৃষ্ট করবে, সাধারণ লোকের জন্য চাই গণপতি পূজা।'' বিপিন চন্দ্রকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে হিন্দুত্বই এই জাতীয়তাবাদের আদি ও প্রধান উপাদান। অরবিন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইন্দু প্রকাশে বঙ্গিমচন্দ্রের কৃতির মধ্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের কথাই প্রকাশিত হয়েছে। নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে অরবিন্দ বঙ্কিম প্রচারিত জাতীয়তার মধ্যেই নরমপন্থার উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির' লেখার প্রেরণা ছিল এই আনন্দমঠ ও তিলকের শিবাজী উৎসব। সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে জাতীয়তার প্রাথমিক সোপান হিসাবে ব্যবহার ও দেশামাতৃকার একটি অত্যুজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনা বঙ্কিমীয় বঙ্গদর্শনের সাধনা ছিল।

১৮৭৬ সালে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তার প্রকাশ হয় তখন তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ি থেকে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হলো ভারতী পত্রিকা। ঠাকুরবাড়ি থেকেই এই পত্রিকার বিকাশ ঘটে। ভারতীর প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীকে ধর্ম-দর্শনেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্যরা তাকে সাহিত্য পত্রিকাতে রূপান্তরিত করতে চাইলেন। কিন্তু ধর্ম, দর্শন ইতিহাস ও পত্রিকাতে প্রকাশনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না হওয়াতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রায়ই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হোত।

১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে পর পর সাধনা ও বালক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই ঠাকুরবাড়ি থেকেই। রবীন্দ্রনাথ সাধনার যেমন সম্পাদক ছিলেন তেমনি ভারতী পত্রিকারও সম্পাদক হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন ''সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো। আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করার জন্য একে আমি ফেলে মরণে পড়তে দেব না।'' রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাদুটিকে সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্য পরিমণ্ডলের জন্য যেমন ব্যবহার করতে লাগলেন তেমনি দেশধর্ম ও জাতীয় জাগরণের জন্য ও এই পত্রিকাদুটি ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে শক্তিশালী অস্ত্রস্বরূপ। সাধনাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন ঔদাসীন্য এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির প্রসঙ্গ যেমন উত্থাপিত করেছেন, তেমনি বাঙ্গালির হৃদয়ানুভূতি, তার প্রবণতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে জাতির ঐক্যের নিজ আদর্শ ও প্রচার করেছেন।

এর পর বিংশ শতাব্দী শুরু হলে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আরও বহু পত্রিকার, কিন্তু হিন্দুসমাজ জাগরণের যে মূল সুর গাঁথা হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে তা ছিল অব্যাহত। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন বেঙ্গল পত্রিকা। অরবিন্দ প্রকাশ করেন 'কর্মযোগিন'। প্রকাশিত হয় সঞ্জীবনী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বন্দেমাতরম্, মানসী, নারায়ণ, সহজপত্র ইত্যাদি পত্রপত্রিকা। এদের আদর্শে তখন সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন গভীরভাবে মুখরিত— তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতার সংঘর্ষ— জাতিকে ঐতিহ্য বন্ধনে বিধৃত করার এক পূত ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্ম।

(রচনাটির জন্য তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন মালদার প্রবীণ স্বয়ংসেবক, শিক্ষাবিদ অগ্রজপ্রতীম ড. তুষারকান্তি ঘোষ)

বাংলা পাঁজির ইতিকথা

নবকুমার ভট্টাচার্য

পঞ্জিকা কথাটি সংস্কৃত শব্দ। যাতে মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি জানা যায় তাই পঞ্জিকা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বছরের প্রথমে দৈবজ্ঞের কাছ হতে পঞ্জিকা শুনতে হয়। যা শুনলে অশুভ বিদূরিত হয়। সুপ্রাচীনকালে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে পঞ্জিকার ফলাফল শুনিয়ে অর্থ রোজগার করতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, দিন পঞ্জিকা শোনার ফলে দুঃস্বপ্ন নাশ, নক্ষত্রে পাপ নাশ হয়। তিথিতে গঙ্গাতুল্যফল, যোগে সাগরসঙ্গম সদৃশ ফললাভ হয়। আমাদের রাজ্যে যাকে পঞ্জিকা বলা হয় বাংলার বাইরে তা 'পঞ্চাঙ্গ' নামে প্রচলিত। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ— এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে পঞ্জিকায় আলোচনা থাকে বলে একে বলা হয় 'পঞ্চাঙ্গ'। তবে বাংলা পঞ্জিকায় আরও বহু বিষয় স্থান পেয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে পাঁজি অন্যতম। সবচেয়ে পুরনো যে পাঁজিটি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে সেটি সঙ্কলিত হয় মিশরের রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে (১২৯০-১২২৩ খৃষ্টপূর্ব)। বাংলাদেশে পঞ্জিকা গণনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ অনুসারে খৃষ্টিয় ষোড়শ শতকের শেষ দশকে রচিত রাঘবানন্দের স্মরণী গ্রন্থই বাংলা পঞ্জিকার মূল উপাদান। যতদূর জানা যায়, ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'রামহরি পঞ্জিকা' হলো বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৫৩। এই পঞ্জিকায় একটিমাত্র ছবি ছিল। যাতে দেখানো হয়েছে এক দেবী সূর্যের রথ টেনে যাচ্ছেন। এই একই সময় কলকাতার জোড়াসাঁকো থেকে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় আরেকখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রেভারেন্ট লঙ্-য়ের তালিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১৮০৬ সালের একটি পঞ্জিকার উল্লেখ করেছেন কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি। হাতে লেখা পঞ্জিকা অবশ্য চালু

ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। ১৭২২ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পুঁথির সংবাদ জেমস লঙ্-য়ের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হাতে লেখা পঞ্জিকার সংবাদ উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রতিবেদন থেকেও মেলে। এ সম্পর্কে 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'র নাম জানতে পারা যায়। মনে করা হয় স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথম এর গণনা আরম্ভ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রামরুদ্র বিদ্যানিধি এই পঞ্জিকার গণনাকার্য সম্পাদন করেন। অল্পকাল পরে নবদ্বীপ পঞ্জিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ইংরেজ আমলে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব পঞ্জিকার গণনাকার্য চালিয়ে যান। এই পঞ্জিকা ১৮৬৯ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে যা 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' নামে প্রচলিত। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে ১৮২৫ সালের মাত্র কয়েকবছর আগে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন শুরু হয়। নদীয়ার অগ্রদ্বীপের কাছে একটি গ্রামে গঙ্গাধর নামে এক ব্যক্তি একটি পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা মুদ্রণের কথা এই প্রথম জানা যায়। ১৮২৫ সালে কলকাতা থেকে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সম্পাদনায় একখানি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়, যা কলেজ পঞ্জিকা নামে খ্যাত ছিল। শ্রীরামপুর থেকে আরো অনেক পঞ্জিকা ঊনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮২৫, ১৮৪২ ও ১৮৫৩ সালে চন্দ্রোদয় প্রেস এবং ১৮৯৬ সালে গাঙ্গুলি প্রেস থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ সালের সংবাদে দেখা যাচ্ছে।

"এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলাও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।"

লঙ সাহেব আরও কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন যেখানকার পুঁথি পঞ্জিকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জনাই, বকসা, কৃষ্ণনগর, কোদালিয়া, দিগ্‌সা ও বিষ্ণুপুর। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ সালে একটি পাঁজির দাম ছিল এক টাকা। ১৮৫৭-তে এর দাম দাঁড়িয়েছিল দু'টাকা। ১৮৫৭-তে শুধু কলকাতার বাজারে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁজি বিক্রি হয়েছে বলে জেমস লঙ সাহেব প্রমাণ পেয়েছিলেন। ১২২৭ সনে যে পাঁজি প্রকাশিত হয় তাতে কিছু পরিবর্তিত বিষয় ছিল। এই সময় থেকে প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রান্তি ঠাকুরের ছবি দেওয়া আরম্ভ হয়। তখন কলকাতায় কোনো বইয়ের দোকান না থাকায় পাঁজি বিক্রি হোত ছাপাখানা

থেকেই। মুটেরা ঝাঁকায় ভর্তি করে পাঁজি নিয়ে পথে পথে ফেরি করে বেড়াত।

পঞ্জিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিতের সঙ্কলিত পঞ্জিকায় স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিত। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে দেশীয় তারিখ অনুযায়ী নানাবিধ অনুষ্ঠান ও রাজকার্য পরিচালনা করত। কিন্তু বিভিন্ন লোকের দ্বারা সঙ্কলিত হাতে লেখা পঞ্জিকায় প্রায়ই তারিখ বার ইত্যাদির রকমফের দেখা দেওয়ায় রাজকার্য বিঘ্নিত হোত। তাই সরকারের অনুরোধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এক আলোচনা সভায় পঞ্জিকা সংকলনের একটি সর্বসম্মত বিধি স্থির করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা সঙ্কলন করিয়ে স্থানীয় নবাব, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বিতরণ করতেন। এইসব কারণেই বাংলা পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠপোষক তাঁকেই বলা হয়। তাই প্রথমদিকে আমরা প্রায় সব মুদ্রিত পঞ্জিকায় দেখতে পাই সঙ্কলকরা মুখবন্ধে লেখেন— ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে’ বা ‘নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে’ সঙ্কলিত।

স্বাধীন ভারতে এই সমস্যার সমাধান করতে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি করে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৫৫ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকার সমস্ত তথ্যাদি গণনার সুপারিশ করে। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে ইংরেজি, বাংলা এবং আরও ১০টি ভারতীয় ভাষায় প্রতিবছর ‘রাষ্ট্রীয় দিনদর্শিকা’ প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা হলো শকাব্দ মতে। এতে বছরের প্রথম মাস ধরা হয় চৈত্রকে। বছর ৩৬৫ দিনেই হয়। ইংরেজি ২২ মার্চ চৈত্রের প্রথম দিন গণনা শুরু হয়। লিপইয়ারে ২১ মার্চ থেকে হয়। এতে বছরের প্রথম ৬ মাস সবই ৩১ দিনের হয়। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকার মাসগুলির ক্রম হলো : (১) চৈত্র, (২) বৈশাখ, (৩) জ্যৈষ্ঠ, (৪) আষাঢ়, (৫) শ্রাবণ, (৬) ভাদ্র, (৭) আশ্বিন, (৮) কার্তিক, (৯) অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ), (১০) পৌষ, (১১) মাঘ, (১২) ফাল্গুন। শকাব্দ চান্দ্রমাস অনুসারে বছর ধরা হয়। বঙ্গাব্দ সৌরমাস অনুসারে হয়। ভারত সরকার বাংলাভাষায় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করলেও বাংলায় এখনো তা বহু মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।

বিগত দু’শ বছরে বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা পঞ্জিকা প্রকাশিত হলেও সে সমস্ত পঞ্জিকার প্রচলন এখন আর নেই। বর্তমানে গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি, পিএম বাগচির ডাইরেক্টরি, পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরি, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, বেণীমাধব শীলের ডাইরেক্টরি প্রভৃতি পঞ্জিকাগুলিই হলো বর্তমানকালের উল্লেখযোগ্য বাংলা ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা।

মনীষী কথা

রবি ঠাকুরের নামকরণ

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্ম হলো দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর অষ্টম পুত্রের। ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, মধ্যরাতে। ঠাকুরবাড়িতে আরো একবার আনন্দের ঢেউ উঠলো, যেন কোনো উৎসব। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো এই নবাজাতককে। কী সুন্দর দুটি চোখ। কী সুন্দর গায়ের রঙ। যেন কোনো দেবশিশু স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

সদ্যোজাত শিশুর জন্মপত্রিকা তৈরি করা ঠাকুর বাড়ির নিয়ম। জ্যোতিষী রামচন্দ্র আচার্যের উপর ভার পড়ল ঠিকুজি লেখার। তিনি গণনা করলেন নবজাতকের ভাগ্য। এবার করতে হবে শিশুটির নামকরণ। দেবেন্দ্রনাথ নিজে এই কাজ করবেন। ধুমধাম করে তার আয়োজন করা হলো। সেদিন সকাল থেকে বাড়িতে একটা হৈ হৈ ব্যাপার। এর আগেও তো অনেকের নামকরণ হয়েছে কিন্তু এবারেরটা একটু অন্যরকম। এবার পুরোহিত নয়, সমস্ত নিয়ম আচার করবেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ। এক নতুন পদ্ধতিতে। যা আগে কেউ কখনো করেনি। কত বড় বাড়ি, কত বড় পরিবার, কত ঘর। সবার ঘরে ঘরে বিলি করা হচ্ছে খই মুড়ি মিষ্টি সন্দেশ। কেউ যেন বাদ না পড়ে। বাড়ির মেয়েরা সব এই নিয়েই ব্যস্ত।

অবশেষে এল সেই শুভক্ষণ অর্থাৎ নামকরণের পালা। সবাই অপেক্ষা করে আছে এই নতুন অনুষ্ঠান দেখার জন্য— দেবেন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর ছেলের নামকরণ করেন। তাঁর কথামত আনা হলো সুন্দর একখানি পিঁড়ি। জ্বলে উঠলো হোমাগ্নি, পিঁড়িটিকে রাখা হলো সেই হোমাগ্নির পাশে। চারিদিকে দেওয়া হলো আলপনা। এবার পিঁড়ির চারিদিকে সারি সারি মোমবাতি বসিয়ে দিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

সবাই একমনে দেখছে এই মঙ্গল অনুষ্ঠান। এরকম অনুষ্ঠান আগে কেউ দেখেনি। দেবেন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আলপনা দেওয়া সেই পিঁড়িখানির দিকে। তারপর রক্তচন্দন দিয়ে পিঁড়ির মাঝখানে লিখলেন একটি নাম—রবীন্দ্রনাথ। কী সুন্দর নাম!

একে একে জ্বলে উঠলো সব মোমবাতি। সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লাল অক্ষরে লেখা নাম— রবীন্দ্রনাথ। যা আজও জ্বলজ্বল করছে।

বিরাজ নারায়ণ রায়

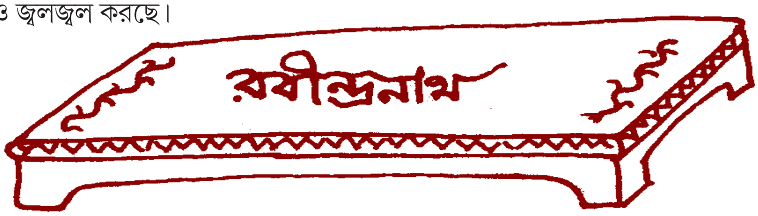

রাজ্য পরিচিতি

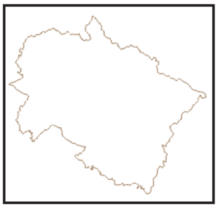

দেবভূমি উত্তরাখণ্ড

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তর ভারতের পার্বত্য রাজ্য উত্তরাখণ্ড। পূর্বে নেপাল ও উত্তরে তিব্বত বেষ্টিত এই রাজ্যে অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র থাকার কারণে একে দেবভূমি বলা হয়। এখানে রয়েছে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, হরিদ্বারের মতো পবিত্র তীর্থস্থান। ভারতের অন্যতম প্রধান দুই নদী গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি এই রাজ্য। হিমালয়ের একটি উচ্চ শিখর নন্দাদেবী এখানেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় দেশ-বিদেশ থেকে এখানে সারা বছর বহু মানুষের সমাগম হয়।

২০০০ সালে দেশের ২৭তম রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ডের আত্মপ্রকাশ। মোট আয়তন ৫৩ হাজার ৫৬৬ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ ৬ হাজার ৭৫২ জন। উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুন।

প্রশ্নবাণ

১.স্ট্যাচু অব লিবার্টি কোন্ দেশে?

২.ইউনাইটেড স্টেটস-এর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কী নামে পরিচিত?

৩.নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর কারাগারে ছিলেন?

৪.বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ে কোন্ মরুভূমির উল্লেখ আছে?

৫.'নিশীথ সূর্যের দেশ' কাকে বলা হয়?

উত্তর : ১. আমেরিকা। ২. হলিউড। ৩. ২৭ বছর। ৪. কালাহারি। ৫. নরওয়ে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

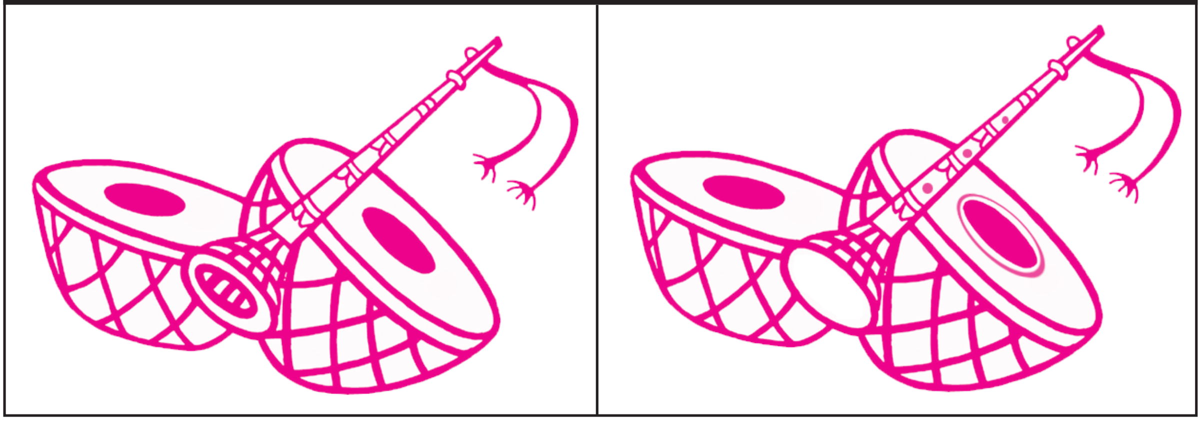

ছোটদের কলমে

সবাই বলে ভালো

সৌজন্যা সরকার, নবম শ্রেণী, নদীয়া

ছোট ছেলে বিনয় নাকি সবার চেয়ে কালো
তবু পরীক্ষাতে গুরু মশায় তাকেই বলেন ভালো।
গোরু নিয়ে যায় সে মাঠে পাকলে সে ধান কাটে
বস্তা বোঝাই কুমড়ো পটোল বিকায় গ্রামের হাটে।

মানীরে সে প্রণাম জানায় মানে বাপে-মায়ে
বাজায় বাঁশী গাজন মেলায় বসে বটের ছায়ে।
কেমন করে যন্ত্র বানায় রাতে জ্বালায় আলো
লেখাপড়ায় সবার সেরা সবাই বলে ভালো।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

মেয়েদের সুরক্ষা মেয়েদের হাতে

রিনি রায়

সাম্প্রতিককালে নির্ভয়াকাণ্ড আমাদের দেশের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর বিচারকার্যের আইনানুগ প্রক্রিয়ায় একজন নাবালক অপরাধীর দণ্ডাদেশের মেয়াদ শেষ হয়। এরপর আমাদের দেশে প্রশাসন এবং আইন প্রণয়নকারীরা এই ধরনের অপরাধের বিভিন্ন দিক বিচার করেছেন এবং অপরাধীর নাবালকত্ব এবং সাবালকত্বের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন। মোটের উপর নারীর প্রতি চরম লাঞ্ছনা এবং অবমাননাকারীর প্রতি আইন প্রণয়নকারীদের ভাবনা চিন্তার একটা প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এত গেল অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর প্রতিকারের আয়োজন এবং ব্যবস্থা। কিন্তু যেক্ষেত্রে নির্যাতিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন সেখানে প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধের আগাম চিন্তা করাই যুক্তিসঙ্গত এবং যা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করবে। আজ থেকে একশো বছর আগে একজন নারীর জীবনযাপনের রূপরেখা আজকের প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হয় না। আজকের নারী বিভিন্ন কারণে বাড়ির বাইরে যায় বা যেতে হয়। তার শিক্ষার জন্য, তার চাকুরি বা জীবিকার জন্য এবং অন্যবিধ প্রয়োজনেও তাকে বেরোতে হয়। আমাদের সমাজে দুষ্প্রবৃত্তি পরায়ণ ব্যক্তিদের শুধু সংখ্যাধিক্যই ঘটেনি, তাদের এই অমানবিক, পাশবিক আচরণকেও পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপন এবং তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষেরা এই রকম কাজ করছেন। যার ফলে এই ধরনের দুর্বৃত্তরা এক ধরনের সহায়তা লাভের আশ্বাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের বা নারীজাতিকে নিজের সম্মান, সুরক্ষা, সর্বোপরি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হচ্ছে। আমাদের দেশে আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে খালসা পন্থের উদ্ভব হয় যেখানে নারী এবং পুরুষ নির্বিশেষে অস্ত্রধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আইনের চোখে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অস্ত্রধারণের বা অস্ত্রবহনের অনুমতি দিলেও এটা সাধারণভাবে সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই সর্বপ্রথম প্রতিরোধের জন্য নিঃশস্ত্র প্রতিরোধের কলাকৌশল শিক্ষার অপরিহার্যতা অনুভব করা যায়। এই ধরনের কলাকৌশলের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের দেশজ যে সকল কলাবিদ্যা আছে, সেগুলির অনুশীলন করতে পারি। যেমন— কালাডি। মণিপুরেও এই ধরনের মার্শাল আর্ট প্রচলিত আছে। এছাড়াও বিদেশি জুডো, ক্যারাটে, কুংফু, কিক বক্সিং এগুলোতেও মেয়েদেরকে প্রশিক্ষিত করবার উদ্যোগ নেওয়ার দরকার। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খানিকটা সখের শরীরচর্চার অঙ্গ হিসাবে অনুশীলিত হয়। তাই যখন কোনো মেয়ে বিপদে পড়ে তখন এই বিদ্যা খুব বেশি কাজে লাগানো যায় না। কারণ তার শিক্ষাটাই থাকে বহুলাংশে আর পাঁচটা এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মতো। তাতে প্রতিরোধ করার যে মৌলিক চিন্তা, সেটা রক্ষা হয় না। আজকের পরিস্থিতিতে মেয়েদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ) এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উৎসাহিত করার দরকার আছে এবং বিশেষভাবে সমাজের সর্বাধিক সংখ্যার মেয়েরা যেহেতু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি) প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ করে, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এ বিষয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তার সঙ্গে ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং এই পরিকল্পনার ফলাফল নিয়ামক কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত জানাতে হবে। যদি এইভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা শুরু করা হয়, তো কয়েক বছরের মধ্যে এক বিশালসংখ্যক এই ধরনের কলাকৌশল প্রশিক্ষিতাদের দেখতে পাবো। পরিণতিতে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন মেয়েদের সম্পর্কে দুরাচারীরা তাদের ভাবনা পরিবর্তন করবে। কারণ এই ধরনের কাজ করতে যাওয়ার আগে তারা দু'বার ভাবতে বাধ্য হবে। মানুষ মাত্রেই জীবন রক্ষার এবং সম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আর সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার অধিকারও আছে। তাই আজ মেয়েদের সুরক্ষার জন্য মেয়েদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্যই সমাজকেও এব্যাপারে সহায়তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির আয়োজন করতে হবে। ■

নেহরু-গান্ধী পরিবার ও ভারতের দারিদ্র্য

অতিথি কলম

সদানন্দ ধুমে

পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিই কি ভারতকে দরিদ্র দেশ বানিয়ে রেখেছে? এই ভাবনাটি সম্প্রতি বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে এক সভায় তাঁর বক্তৃতায় প্রায় অর্ধ উচ্চারিত বক্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে। অবশ্য বিজেপি দলের বহু সদস্যই এই ধারণারই অংশীদার। কেননা এটা তো নির্দ্বিধায় মেনে নিতেই হবে যে দীর্ঘ ৭০ বছরের (খুব অল্প সময় বাদ দিলে) নেহরু-গান্ধী পরিবারের শাসনের পরেও ভারত দরিদ্রই থেকে গেছে। একটা গুঞ্জন দানা পাকাচ্ছে বিজেপিকে ২৫টা বছর দাও ভারত হয়ে উঠবে 'বিশ্বগুরু'।

অবশ্যই বিজেপির এই দাবিকে যথেষ্ট কাটছাঁট করে নিলেও ওই আদি সত্যটাকে অস্বীকার করা যাবে না যে নেহরু-গান্ধীদের শাসন- ত্রুটিতেই ভারত পূর্ব-এশিয়ায় আজও একটি পিছিয়ে পড়া দেশ। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির থেকে অর্থনৈতিক প্রগতিতে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ দেশে পারিবারিক শাসন কায়েম থাকা। কংগ্রেস দলের ওপর পরিবারের

> **বিশ্লেষকদের মতে, পরিবারতন্ত্রের ফলে ভারতে দারিদ্র্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। বাস্তবে নেহরু পরিবারের ছত্রছায়ায় তাঁবেদারিতে না থাকলে কংগ্রেসের কোনোই প্রয়োজন হোত না স্বাধীন ভারতের কিছু অপদার্থ অর্থনীতিবিদ বা নিকম্মা প্রকল্প নির্ধারকদের দেবতার আসনে বসিয়ে তাদের মহান বানানোর।**

ইচ্ছে অনিচ্ছে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন ১৯৯১ সালে লাগু হওয়া সংস্কারকে অনেকাংশেই রুদ্ধ করা হয়, সেই সঙ্গে দলের নীতি বহু ক্ষেত্রেই পারিবারিক খেয়ালখুশিকে মর্যাদা দিতে দেশে উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর একথাটা জলের মতো পরিষ্কার— যতদিন সোনিয়া গান্ধী বা তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধী কংগ্রেস দলের ক্ষমতার শীর্ষে থাকবেন ততদিন কংগ্রেসের পক্ষে সংস্কারের পক্ষে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। চরম দক্ষিণপন্থী ভাবধারার কিছু চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন একটা কথা খুবই চালু আছে যে, নেহরু-গান্ধী পরিবারের শাসকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই দেশের মানুষকে পিছিয়ে রাখতে চাইতেন যাতে তাঁদের পক্ষে একটি গরিব ও অশিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীকে তাঁবে রাখা যায়। যদিও যেকোনো চক্রান্তের থিয়োরিকেই যেমন কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই তেমনি অকাট্য যুক্তি জালগুলিকেও উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। ইতিহাস বলছে, স্বাধীন ভারতের প্রথম ৪২ বছরের (৪৭ থেকে ৮৯) মধ্যে ৩৭ বছরই দেশ শাসন করেছিলেন জওহরলাল, ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধী। বাস্তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা এশিয়ার সর্বপেক্ষা ব্যর্থ শাসক হিসেবেই তাঁদের পরিচিতি রেখে গেছেন।

এরই বিপরীতে নরসিমহা রাও, বাজপেয়ী যাঁরা ১৯৯১-এর সংস্কার পরবর্তী জমানায় দেশ শাসন করেছেন তাঁরা কোনো পরিবারতন্ত্রের সদস্য ছিলেন না। অনেক সময়ই তাঁদের কাজের মাধ্যমে এটা দেখা গেছে যে মুখে বা ভাষণে না প্রকাশ করলেও বাস্তবে নেহরুর অর্থনৈতিক সূত্রের মূল স্তম্ভগুলিকে চূর্ণ করেই তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ সুগম করতে এগিয়েছিলেন। দু' একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা একাধিক পূর্বপরিকল্পিত দেশের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস পোষণ করা ও তার ফলে বাণিজ্যে বিরত থাকা। বা ব্যবসা করলে মুনাফা করাটা আবশ্যিক নয় (রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক প্রভাব) বা সরকারি যোজনাগুলির ওপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে খোলা বাজারের শক্তিকে দমিয়ে রাখা। অর্থাৎ দেশে প্রতিযোগিতার বাতাবরণ গড়তে না দেওয়া। যেমন আজ অজস্র টেলিকম অপারেটার বা গাড়ি নির্মাতা বা টিভি চ্যানেলের মধ্যে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নজরে পড়ে যার ফলে উপকৃত হয় উপভোক্তা, তা ভাবা যেত না।

সত্যি কথা বললে খারাপ লাগলেও না বলে উপায় নেই যে সোভিয়েত অর্থনৈতিক মডেল নিয়ে নেহরু মানসিক বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে দেশকে এক বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতির রাস্তায় ঠেলে দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই বিখ্যাত উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ বি আর শ্যেনয় ও তৎকালীন ভাবী নোবেল পুরস্কার বিজেতা মিল্টন ফ্রিয়েডম্যান কিন্তু ভারতের গৃহীত রাস্তা নিয়ে বিপদ ঘণ্টি বাজিয়েছিলেন। হায়! নেহরু কিন্তু কোনো দিক নির্দেশ তো দূরস্থান তৎকালীন চালু চিরাচরিত পথেই ঢিমেতালে চলেছিলেন।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম ইস্টারলি তাঁর ‘Tyranny of Experts’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন পণ্ডিত ‘গুনার মিরডাল’ বা আর্থার লুইসের ব্যর্থ অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করে শুধু ভারত নয়, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান, ল্যাটিন আমেরিকান দেশের মানুষও অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও তার পরিণতিতে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তবুও এরও ওপরওয়ালা আছেন তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর পরিকল্পনার ভুলে কোটি কোটি ভারতীয় গরিবির জালে জড়িয়ে পড়ে। দেশে যে যোজনা কমিশনের নির্দেশিত পথে কোনো অর্থনৈতিক উন্নতিই হচ্ছিল না সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে তিনি উল্টে তাঁর পিতার দেখানো পথে দেশের যোজনার বহর দু’গুণ বাড়িয়ে দিলেন। পিতার পাপের স্খলন তো হলোই না বরং দেশ সেই সন্দেহাতীত নয় এমন নেহরুভিয়ান মডেলেই ডুবতে থাকল। তিনি একটি সর্বৈব ব্যর্থ অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চললেন।

পরিসংখ্যান দিলে সহজ হয়ে যাবে। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা যখন শাসনক্ষমতায় এলেন সে সময় দেশবাসীর গড় আয় ছিল গড় ইন্দোনেশিয়াবাসীর ৫ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ানদের ১০০ টাকা হলে আমাদের ৮০ টাকা। আবার একজন দক্ষিণ কোরিয়ান গড়ে ১০০ টাকা আয় করলে তখন একজন ভারতীয়ের আয় ছিল ৫০ টাকা। ঠিক ১৯৯০ সাল নাগাদ যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পাওনা মেটানোর সমস্যা দানা পাকালো ও ভারত সংস্কারের পথে যেতে বাধ্য হলো তখন একজন ভারতীয়ের আয় ছিল গড় ইন্দোনেশিয়ার আয়ের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ টাকা আর একজন দক্ষিণ কোরিয়ানের ১০০ টাকা হলে আমাদের ১৭ টাকা। সেই সময় দেশের ৮৭ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশির আয় বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া ১.৯০ ডলার (দিন প্রতি যে চরম দারিদ্র্যের আয়সীমা) ধার্য আছে তারাই আশেপাশে ছিল। অর্থাৎ দেশ অর্থনৈতিক সর্বনাশের গতিমুখ ঠিকই রেখেছিল। তাহলে এই অবনমনের ইতিহাস এখনও কি প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই। ১৯৯১ সাল থেকে ‘অন্ধ গলির’ হতাশ রাস্তা থেকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে ভারত আজ বিশ্বঅর্থনীতির একটি উজ্জ্বল বিন্দু। যার অবশ্যম্ভাবী কারণ ছিল সংস্কার। আজকের ভারতীয়দের মাত্র ৫ ভাগের ১ ভাগ কেবল চরম দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করছেন। আশা করা যাচ্ছে, যে পথে দেশ চলেছে অনতিবিলম্বে এই পরিসংখ্যান শূন্যে নেমে আসবে। অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে হলে তারা সন্তর্পণে নেহরু-গান্ধী পরিবারের এই কু-কীর্তিকে ধামাচাপা দিয়ে নরসিমা রাওকে এক মহান নেতা বানিয়ে কৃতকর্মকে বিস্মৃত হতে পারত। তারা তা না করে নরসিমাকে চরম অবমাননার মাধ্যমে ভুলে যেতে চাইল। আর বাজারে প্রচার করল দেশে যে সংস্কার লাগু হয়েছিল— চরম দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করাটা— তার জন্য Launching pad (পরীক্ষা ক্ষেত্র) ছিল ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয়। তাই এই সংস্কারের পূর্ণ কৃতিত্ব নেহরু-গান্ধী পরিবারের। আর এই সাফল্যের লঞ্চ প্যাড তৈরির ইচ্ছের প্রকল্পটিও (মানুষকে ভিখারি করার) এই পরিবারের বিরাট কৃতিত্বের মধ্যেই পড়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, গান্ধী পরিবারের বর্তমান ধ্বজাধারীরা অন্তত উঠতে-বসতে মহামতি লেনিনকে উদ্ধৃত করে বলেন না যেমন নেহরু বলতেন, ‘‘সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলি একবারে অর্থনৈতিক সাফল্যের শিখরে উঠবে (Commanding heights)’’। কিন্তু অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবারের ধ্যান ধারণা এখনও নেগেটিভ। কথাটার সত্যতা নরসিমা রাওয়ের সঙ্গে মনমোহনের পাঁচ বছর আর সোনিয়ার খবরদারিতে মনমোহনের পরবর্তী ৫ বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই পরিষ্কার হবে। নরসিমা রাওয়ের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভারতীয় ঐরাবতকে খোলা মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর সোনিয়ার দখলদারিতে তিনি অর্থনীতিকে অনাবশ্যক খয়রাতিমূলক বহু প্রকল্পভারে জর্জরিত শুধু করেননি অর্থনৈতিক স্থায়ী প্রগতির লক্ষ্যে তেমন কিছু প্রকল্পেও হাত দিতে পারেননি। অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর ভুলে যেতে পারলেই বেশি ভাল হয় এমন একটি রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশই জুড়ে রয়েছে উদ্যোগপতি বা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্রমিক বিষোদ্গার। যার অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে ২০১০ সালে তিনি ওড়িশার Vedanta কোম্পানির ১.৭ বিলিয়ন ডলারের বক্সাইট খনিজ উত্তোলন প্রকল্প বাতিল করেন। খেয়াল করলে দেখা যায়, এই নবীন গান্ধীটির বাণীর মধ্যে প্রায়ই ‘Two India’ বা অর্থবান শিল্পপতি বা ধনাঢ্যদের উদ্দেশে এক বিজাতীয় কৃত্রিম ঘৃণা পোষণকারী বক্তব্য যেমন ‘people who drive big-big cars’ ইত্যাদি শোনা যায়। এগুলির মধ্যে যত না দেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের আন্তরিক চিন্তা থাকে তার থেকে অনেক বেশি থাকে লোক-দেখানোপনা, যার নাম নাটকবাজি। অবশ্য সংস্কার প্রক্রিয়ায় শ্লথগতির জন্য মোদী সরকার নিজে দায়ী হলেও রাহুল গান্ধীর ‘স্যুট বুট কি সরকার’-এর মত আলটপকা কথাটি নীতি প্রণয়নের বাতাবরণকে বেশ খানিকটা বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাই বলছি বিশ্লেষকরা ঠিকই বলেছেন পরিবারতন্ত্রের ফলে ভারতে দারিদ্র্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। বাস্তবে নেহরু পরিবারের ছত্রছায়ায় তাঁবেদারিতে না থাকলে কংগ্রেসের কোনোই প্রয়োজন হোত না স্বাধীন ভারতের কিছু অপদার্থ অর্থনীতিবিদ বা নিকম্মা প্রকল্প নির্ধারকদের দেবতার আসনে বসিয়ে তাদের মহান বানানোর।

আজ ভারতের পক্ষে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া তুলনামূলক ভাবে সহজ। তাতে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণগুলিকে উৎপাটিত করার ক্ষেত্রে বাধা টপকানোও এখন সহজ। এখন পরিবারতন্ত্র নেই। ■

With Best Wishes :-

BDJ Stampings Industries Ltd.

ISO 9001 : 2000 Company

8, Rai Charan Paul Lane,

Kolkata - 700 046

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

চিঠিপত্র

জে এন ইউ কাণ্ড এবং কমিউনিস্ট দেশদ্রোহিতা

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জে এন ইউ) ক্যাম্পাসে গত ৯ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবন হামলার মাস্টারমাইন্ড আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে তার ফাঁসির দিনে একদল বামপন্থী ছাত্রছাত্রী এক প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই সভা ও মিছিল থেকে নাকি স্লোগান উঠেছে— 'ইন্ডিয়া গো ব্যাক', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'আফজল গুরু জিন্দাবাদ', 'আফজল কি মৌত নেহি সহেঙ্গে' কিতনে আফজল মারোগে, ঘরঘর সে আফজল নিকলেগা,' 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, লড়কে লেঙ্গে আজাদি', 'বঙ্গাল মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত কি বরবাদি তক জঙ্গ রহেগী, জঙ্গ রহেগী', আরও কত কী। আর এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে তা হবে ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের পক্ষে এক বিরাট হুমকি। তবে এখানেই শেষ নয়। সেই সভা ও মিছিল থেকে নাকি এমনও স্লোগান উঠেছে, আফজলগুরুর ফাঁসি 'Judicial Killing'. ভাবা যায়! আদালতের দেওয়া ফাঁসিকে বলা হচ্ছে 'Judicial Killing' বা বিচারগত হত্যা! বিচার ব্যবস্থার উপরেও অনাস্থা! অথচ ভারতের বিচার ব্যবস্থা বিশ্বে সমাদৃত ও প্রশংসিত। কারণ নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালতের মাঝে আছে দায়রা, উচ্চ আদালত ইত্যাদি। রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর আছে একাধিক সুযোগ। তারপরেও এহেন দেশবিরোধী, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে স্লোগান! জে এন ইউ-কাণ্ডের পর কিছু ছাত্রকে পুলিশ করেছে গ্রেপ্তার। তারা এখন বিচারাধীন বন্দী। তবে বামপন্থী ছাত্রনেতা ও জে এন ইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমার গ্রেপ্তার হলেও সম্প্রতি সে জামিনে মুক্তি পেয়েছে। অবশ্য গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে কিছু সেকুলারবাদী ছাত্রছাত্রীর সমর্থন নিয়ে বাম ছাত্রছাত্রীরা চালিয়ে আসছে মিটিং-মিছিল। বাম-সেকুলারবাদীদের কেউ কেউ সাফাই দিচ্ছেন--- ইন্ডিয়ান পেনালকোডে নাকি দেশদ্রোহিতার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নেই, কোথাও বলা নেই 'ভারতমাতা'র অপমান করা যাবে না ইত্যাদি। এসব কথার অর্থ, ইতিমধ্যেই যাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও দেশের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের অভিযোগ উঠেছে তাদের আইনত বিচারের কোনো সুযোগ নেই। যুক্তি মন্দ নয়। তবে ওই সব যুক্তিবাদীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারাটি দেশদ্রোহী বিচারের ধারা। তবে যে যাই-ই বলুক না কেন, আইন তার নিজের পথেই চলবে। কে দেশদ্রোহী, আর কে নয়, সে বিচারের ভার আদালতের উপরেই ন্যস্ত।

সত্যি বলতে কী, জে এন ইউ-কাণ্ড বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। দেশের বিরুদ্ধে বলা, দেশকে অপমান করা বা কমিউনিস্ট দুনিয়ার হয়ে ওকালতি করা, চীন-রাশিয়ার এদেশের এজেন্ট কমিউনিস্টরা চিরকালের বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী। জে এন ইউ-কাণ্ডের পাণ্ডারা সেই কমিউনিস্টদেরই ভাবশিষ্য। তাই তারা দেশের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান ও আফজল গুরুর ন্যায় দেশদ্রোহির পক্ষে সমাবেশ করেছে, স্লোগান দিয়েছে। আসলে এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাস, পরম্পরাগত ঐতিহ্য, ধর্ম-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র, দর্শন, জাতীয়তা বা যা কিছু ভালো, সবকিছুকে অশ্রদ্ধা ও অস্বীকার করে আসছেন। এঁদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি অপসংস্কৃতি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভেদ-বৈষম্যের দেশ। অথচ এঁরাই মার্কসবাদের 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'শ্রেণী শত্রু' ইত্যাদি তত্ত্ব আউড়ে এদেশের জনগণকে 'বুর্জোয়া, ও 'সর্বহারা' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং 'শ্রেণী শত্রু খতম'-এর ডাক দিয়ে হত্যা করেছে অসংখ্য জোতদার, জমিদার, বিত্তশালী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও কল-কারখানা বা মিল মালিককে। এ রাজ্য ৩৪ বছরের বাম-রাজত্বে গরিব হয়েছে আরও গরিব। বরং বলা ভালো, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের স্বার্থে এঁরা গরিবকে গরিব করে রেখেছে। পক্ষান্তরে, বহু কমিউনিস্ট নেতা হয়েছে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। আর শিল্প-কারখানা? নৈব নৈব চ। বরং যেগুলি ছিল, তারও অধিকাংশ গেছে বন্ধ বয়ে। বেকার সমস্যা ছিল পর্বত প্রমাণ। বহু মানুষ মারা গেছে ক্ষুধায়। এরাই না গরিবের বন্ধু?

চীন-রাশিয়া, মার্কিন ও বৃটিশের দালাল এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুধু বিরোধিতাই করেনি, স্বাধীনতা সংগ্রামের পিঠে ছুরিও মেরেছে। এরাই স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বিপ্লবীদের বলেছেন সন্ত্রাসবাদী। অর্থাৎ এদের দৃষ্টিতে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, বাঘাযতীন, নেতাজীর ন্যায় লাখো স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। এরা বহু বিপ্লবীকে ইংরেজ-শাসকদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পিসি যোশী ও ইংরেজ সরকারের Home Member স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে চিঠি চালাচালি এবং সখ্যতা সর্বজনবিদিত, যা কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতে বৃটিশ সেনাদের মনোবল বাড়াতে পার্টির গণনাট্য সংস্থা ব্যারাকে ব্যারাকে নাচ-গান-আবৃত্তির আয়োজন করত। সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনেও হাটে-বাজার করত ওই ধরণের অনুষ্ঠান। এমনই একটা গান ছিল— ''কমরেড ধরো হাতিয়ার --- ধরো হাতিয়ার/ স্বাধীনতা সংগ্রামে নহি আজ এক্‌লা/বিপ্লবী সোভিয়েত, দুর্জয় মহা-চীন/সঙ্গে আছে ইংরেজ, নির্ভীক মার্কিন।'' সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর আর কাকে বলে? এরা নেতাজীকে সহ্য করতে পারত না। তাঁকে এরা 'কুইসলিং', 'তোজোর কুকুর', 'পঞ্চম বাহিনী' (বিশ্বাসঘাতক), 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বলে করত গালাগাল। তাঁকে নিয়ে আঁকা কদর্য ব্যঙ্গচিত্র পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'

পত্রিকায় প্রকাশিত হত। আর আজ? সেই ভণ্ড ও নির্লজ্জ কমিউনিস্টরাই রাজনৈতিক স্বার্থে নেতাজীকে মহান বানাতে চাইলেও তাঁকে নিয়েই করেছেন রাজনীতি। কারণ ক্ষমতা যে বড় বালাই।

ওদিকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে এই কমিউনিস্টরাই পাল্টি খেয়ে জিন্নার পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করে বসলেন। এঁরা বললেন--- ''মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি ন্যায্য দাবি।'' এমনকী এরা এও বললেন— ''পাকিস্তান দিতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।'' আর যে কমিউনিস্টরা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বলে জাহির করেন, তাঁরাই সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারাকে করলেন সমর্থন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিমত, কমিউনিস্টদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও পাকিস্তানদাবিকে সমর্থন '৪৬-এর কুখ্যাত 'কলকাতা মহাদাঙ্গা' এবং অভিশপ্ত দেশভাগকে ত্বরান্বিত ও সফল করেছে। (এঁরা 'গোর্খাল্যান্ড'-এরও সমর্থক ছিলেন। এরা যে কতবড় দেশদ্রোহীতার প্রমাণ, '৪৭-এ ভারত স্বাধীন হলে এরাই আবার বলল, ''ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।'') '৬২-র চীনা আগ্রাসনকে এরা অস্বীকার করে বলছিল। ''চীন ভারত আক্রমণ করেনি, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে।'' তাই চীনের দালাল কমিউনিস্টদের কাছে প্রশ্ন, সামরিক দিক থেকে চীনের চেয়ে দুর্বল তৎকালীন ভারত মহাশক্তিধর চীনকে আক্রমণ করেছে কোন্ দুঃসাহসে? তাছাড়া সেই যুদ্ধে চীনের মৃতসেনাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভারতীয় সেনার মৃত্যু ঘটেছে, ক্ষয়ক্ষতিও অনেক বেশি। আকসাই চীনসহ এক বিশাল ভারতীয় ভূখণ্ডও দখল করে নিয়েছে চীন। এসব সম্ভব হলো তবে কীভাবে? আপনারাই সেসময়ে বলতেন না, ''চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'' আসলে মস্কো, বেজিংয়ে বৃষ্টি পড়লে আজও আপনারা এদেশে ছাতা মেলেন। তাই না?

জে এন ইউ-কাণ্ডের পর রাজনীতির দুই মেরুতে থাকা সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি ও কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ছুটে গিয়েছেন জে এন ইউ-তে। উভয়ই ছাত্র আন্দোলনকে তোল্লা দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে দিয়েছেন গরম ভাষণ। এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা হাত মিলিয়েছেন। কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে। জনসমর্থনও তলানিতে। তাই ক্ষমতার মধু পান করতে উদ্‌গ্রীব কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা নির্বাচনে হাত ধরাধরি করে লড়তে হয়েছেন বাধ্য। অথচ এই কমিউনিস্টরাই একদা কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত-বুর্জোয়াদের দল, ইন্দিরা গান্ধীকে স্বৈরাচারি, রাক্ষুসী ও রাজীব গান্ধীকে 'বোফর্স গান্ধী' বলে গালাগাল করেছেন। তবু কংগ্রেস সব ভুলে ক্ষমতার লোভে হাত ধরেছে কমিউনিস্টদের। ধিক্ কংগ্রেস ধিক্! ধিক্ কমিউনিস্ট ধিক্!!

—***ধীরেন দেবনাথ,***
কল্যাণী, নদীয়া।

বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা

বর্তমানে শিকাগো অঞ্চলে অবস্থিত আমার কর্পোরেট দপ্তর থেকে (www.hrdsinc.org) চিকিৎসা বিজ্ঞান (medical college) সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের (www.sjsm.org) প্রশাসন পরিচালিত হয়। আমি এই প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক। মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্র ভাষায় সর্বস্তরের শিক্ষা প্রচলন করবার ত্রিভাষা সূত্র সম্বন্ধীয় শ্রী দীননাথ বত্রা মহাশয়ের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এবং আমার সতীর্থ সম্প্রদায় কয়েকটি কাজে হাত দিয়েছে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বিজাতীয় ভাষাকে জীবিকার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে ভারতের ভাষায় পরিণত করা হয়েছে। ইংরেজির চাপে, ছলে বলে এবং কৌশলে প্রার্থীকে তার মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষার প্রতি হীনমন্যতা তৈরি করে নিজ ভাষায় দক্ষতা অর্জনে প্রবল বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই নিদর্শনের সূত্র ধরে বাঙ্গালোরে আমরা আমাদের উদ্যোগ এবং আর্থিক সামর্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করছি। এই প্রতিষ্ঠান অনতিবিলম্বে বিভিন্ন শহরে বিস্তার লাভ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উদ্দেশ্য— ভাষাকে জীবিকার সঙ্গে জুড়ে দেবার একটি জাজ্বল্যমান বাস্তব ছক গড়ে তোলা। আমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের অন্যতম শর্ত হবে— কাজে বহাল থাকতে এবং উন্নতি করতে হলে— স্বদেশি ভাষায় আমাদের সহায়তায় আমাদেরই নির্ধারিত মানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। এই বাস্তব ছকের দৃষ্টান্তকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলবার উদ্যোগ আমরা এখনই নিয়েছি।

দিল্লীতে নিউজগ্রাম নামে একটি নিউজ পোর্টাল আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে। তা ছাড়া বাঙ্গালোরে http://www.nammradio.com/ একটি ইন্টারনেট রেডিও আমাদের কার্যকলাপ বিষয়ে জনমত সংগ্রহ করবার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত রেডিও কান্নড় ভাষাভিত্তিক। অচিরেই একে বাংলা ভাষা সমেত একাধিক ভাষা ভিত্তিক করা হবে। নিউজগ্রাম-এর ওয়েবসাইট-এ গিয়ে আমার নামে খোঁজ করলে--- মাতৃভাষায় সর্বস্তরের শিক্ষা লাভের গুরুত্ব এবং উপযোগিতা বিষয়ক একগুচ্ছ প্রবন্ধের সন্ধান মিলবে যার সঙ্গে দীননাথ বত্রার মত এবং পথের সাদৃশ্য অতি গভীর।

আর একটি পুস্তকের সন্ধান দেওয়া রইল যার মুখবন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলবে— www.onthewaytodenmark.com আগামী এপ্রিলের ছয় তারিখ অবধি আমি কলকাতায় থাকবো। আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায় কি না বা গেলে কীভাবে যায় সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেলে ভাল হয়।

—**ড. কল্লোল গুহ,**
১৪৮০ রেনেসাঁ ড্রাইভ,
স্যুট ৩০০ পার্ক রিজ, শিকাগো

অন্য রকম

ভিখিরি-বন্ধু স্বাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজের ভালো কাজে খুব কম মানুষকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। কারণ সমাজ সচেতন মানুষ আজকালকার দিনে খুবই কম চোখে পড়ে। তারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এরা পিছিয়ে পড়া মানুষদের দিকে ঘুরেও তাকায় না। এদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে কোনোরকম প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এর মধ্যে স্বাতী বন্দিয়া নামে ২৩ বছরের তরুণী ফুটপাতে থাকা ভিখারিদের নিয়ে শুধু ভাবা নয়, কাজ শুরু করেছেন।

দু'দিন আগে পর্যন্ত যে বাচ্চা মেয়েটি দু'বেলা ভিক্ষা করে খেত স্বাতীর জন্য এখন সে মাসে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা উপার্জন করছে। এরকম এক-আধজন নয় বহু ভিখারি ভিক্ষা করা ছেড়ে নিজের হাতে তৈরি করা ঘর সাজানোর জিনিস বিক্রি করে দিন যাপন করছে। তাদের এই জীবন বদলাতে সাহায্য করেছেন স্বাতী বন্দিয়া। মাত্র ২১ বছর বয়সেই ভেবেছিলেন সমাজের গরিব মানুষদের জন্য কিছু করতে। যাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি বলতে কিছু নেই, বস্তি এলাকায় থাকে তাদেরকে সমাজের প্রথম সারিতে আর পাঁচটা মানুষের মতো তুলে আনতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ওম্ শান্তি ট্রেডার্স নামে একটি হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তোলেন। আর এই কারখানার শ্রমিক হলো এই সমস্ত মানুষজন।

ওড়িশার ঝাড়সুগুদার বাসিন্দা স্বাতী বন্দিয়া। তাঁর বাবা একজন শিল্পপতি। স্বভাবতই তাঁর শরীরে বইছে ব্যবসায়ীর রক্ত। সুতরাং এই সমস্ত মানুষদেরকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া যায় সে পরিকল্পনা তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। স্বাতী বেঙ্গালুরুর ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের আচার্য ইনস্টিটিউট থেকে বি বি এ করে বেঙ্গালুরুর মাইশোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আই আই এম করছেন। বর্তমানে আরও এক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামে পাড়ি দিয়ে সেখানকার গৃহবধূদের নিজে হাতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সেখানে ওম্ শান্তি-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। রাখা হয়েছে বেশকিছু প্রশিক্ষক। ওম্ শান্তি ট্রেডার্সের পণ্য বহু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেল-রেঁস্তোরাতে দেদার বিক্রি হচ্ছে। তবে এর কদর শুধু দেশে নয়, বিদেশেও যথেষ্ট নাম ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের বক্তৃতা পেশ করেছেন স্বাতী। থাইল্যান্ড, ব্যাঙ্কক এবং গুজরাটের ল'কলেজ, বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও তার সাড়া জাগানো বক্তব্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে।

স্বাতীর এই উদ্যোগে প্রায় ৩৯টি পরিবার স্বরোজগেরে হয়েছে। তাঁর লক্ষ্য ২০১৮-র মধ্যে কর্ণাটক এবং ওড়িশার মধ্যে প্রায় ২ হাজার পরিবারকে ওম্ শান্তি ট্রেডার্সের আওতায় আনা, যাদের থাকা খাওয়া সুনিশ্চিত করবে এই সংস্থা। তিনি বলেন, ''২০১৭-র মধ্যে সরকারি সাহায্য মিললে এই সংস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সংস্থা বড় হলে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে।'' ওম্ শান্তি ট্রেডার্সে প্রশিক্ষণ নিয়েছে প্রায় ১৮ হাজার ছাত্র। পাশাপাশি ১৫ সদস্যের কোর কমিটি গঠন হয়েছে। এবং কমিশন ভিত্তিক বহু শিক্ষানবিশ এখানে কাজ করছে। একজন ভিখারি এখানে কাজ করে মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা রোজগার করে বলে জানা যায়; তাই ফুটপাত ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে তারা। ওম্ শান্তি ট্রেডার্স দ্য লীলা প্যালেস, তাজ ভিভান্তা ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দয়ানন্দসাগর, আচার্য ইন্সটিটিউট-এর সঙ্গে ব্যবসা করে থাকে।

বিখ্যাত কার্ড কোম্পানি আর্চিস এই ওম্ ট্রেডার্সের অন্যতম ব্যবসায়িক পার্টনার। তবে সবকিছুর শেষে স্বাতীর যুক্তি নারী স্বাবলম্বীকরণ, নারীদের স্বনির্ভর করতেই এই উদ্যোগ।

শিশু শিক্ষার দিকেও তার নজর রয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান। ইংরাজি মাধ্যমে টাকার অভাবে যেসব গরিব ছেলেমেয়ে পড়তে পারে না তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করতে চায় ওম্ শান্তি ট্রেডার্সের কর্ণধার স্বাতী। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

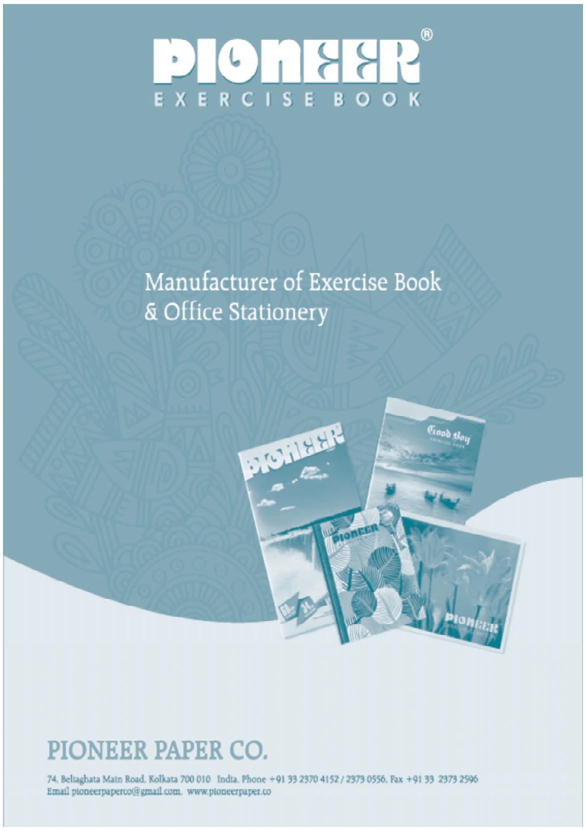

‘চারুকলা একটি মহান অথচ সাধারণ ভাষায় আমাদের ভাব বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে। সেজন্য মাতৃভূমির সংগঠন তথা পুনর্জাগরণের জন্য শিল্পের নবজন্ম অপরিহার্য।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে পুরুলিয়ার আন্তঃ বিদ্যালয় জেলা কবাডি প্রতিযোগিতা

সমাবেশ সমাচার

গত ৬ মার্চ পুরুলিয়া জেলার এম এস এ ময়দানে প্রথম পুরুলিয়ার আন্তর্বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনুর্ধ্ব ১৪ বছরের ছাত্ররা ৯টি বিদ্যালয় থেকে অংশ গ্রহণ করে। সকাল ১০-৩০ মিনিটে খেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কবাডি খেলোয়াড় তথা ভারতীয় কবাডি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বজিত পালিত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহ-খেলকুদ প্রমুখ প্রবোধময় নন্দ, ক্রীড়া ভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মধুময় নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ডাক্তার মনোজ কুমার। ক্রীড়া ভারতীর পতাকা উত্তোলনের পর কবাডি খেলার শুভ সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন অসিত কুমার দে, মনজিত কর্মকার ও সুরেশ লাট। ক্রীড়া ভারতীর জেলা সম্পাদক তথা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার শিক্ষক বিজয় কুমার বাউরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এই কবাডি প্রতিযোগিতা সফলভাবে রূপায়িত হয়। তাঁকে সহযোগিতা করেন দেবরাজ মাহাত।

বান্দোয়ান উচ্চবিদ্যালয়ের কবাডি দল পুরুলিয়া টাউন হাইস্কুলের দলকে পরাজিত করে ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয়। বিজয়ী ও বিজিত উভয় দলকেই ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। বান্দোয়ান দলের বিশ্বজিত মুর্মু এই প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

বিশ্বজিত পালিত আশ্বাস দেন জেলার ভালো কাবাডি খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও প্রদেশ স্তরে সুযোগ করে দিতে তিনি চেষ্টা করবেন। পুরস্কার প্রদানের পর খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের অভ্যাসবর্গ

গত ২৩-২৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দু'দিন ব্যাপী অভ্যাসবর্গ রায়গঞ্জ শহরের সারদা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ও শিক্ষক প্রদীপ অধিকারী। অনেক শিক্ষক সংগঠন থাকা সত্ত্বেও আরও একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদার। শাশ্বত জীবনমূল্য ও শিক্ষকের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। একাত্ম মানবদর্শন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্যামল রায়। অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্রকুমার এই অভ্যাসবর্গে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা নীতি কী? মেকলে প্রবর্তিত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই জাতীয় শিক্ষা হতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। 'শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর'— এই মহান দায়িত্বভার বহন করার জন্য আমাদের সংগঠনের শিক্ষক বন্ধুদের নিজেদেরকে সেইভাবে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে— এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল। শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের নির্ধারিত কয়েকটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন আবশ্যিক— এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত। এছাড়া শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কঠোর শীত উপেক্ষা করেও এই অভ্যাস বর্গে ৫৬ জন শিক্ষক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে ৭৯ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত, রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদার, সাহা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ও সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ জিষ্ণু বসু ও বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চক্রধর ত্রিপাঠী উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

বেলুড়মঠে সংস্কৃত ভারতীর 'সংস্কৃত গঙ্গাসাগর' সম্মেলন

গত ৬ মার্চ সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গ এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত হলো 'সংস্কৃত গঙ্গাসাগর'। অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৪০০ সংস্কৃতপ্রেমী। সভামঞ্চ অলঙ্কৃত করেন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠনমন্ত্রী দীনেশ কামত, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গোপাল মিশ্র এবং আই ই এস্ টি শিবপুরের ডিরেক্টর প্রফেসর ড. অজয় কুমার রায়। সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসারের জন্য সভায় গৃহীত হয় একাধিক প্রস্তাব। যেগুলির মধ্যে মুখ্য হলো বিদ্যালয়শিক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষারূপে সংস্কৃতমাধ্যমেই সংস্কৃত পড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরিবেশ গড়ে তোলা। স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ বললেন যে, পবিত্রতার অছিলা বা অবজ্ঞা নয়, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে হবে এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে অধ্যয়ন করতে হবে। দীনেশ কামত সুললিত সংস্কৃতে বললেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হলো সংস্কৃত ভাষা। তাই ভারতের নিজস্বতার রক্ষা সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমেই সম্ভব। হিব্রু ভাষা পুনরুদ্ধারের মতো সংস্কৃত ভাষাকেও রাষ্ট্র ভাষায় রূপায়িত করা সম্ভব। অজয় কুমার রায় বললেন, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যে ধরনের ব্যাকরণ ব্যবহার করা হয় ঠিক সেইরকম সুসংবদ্ধ ব্যাকরণ সংস্কৃতভাষায় আছে। তাই এই ব্যাকরণ পরবর্তীকালে কম্পিউটার বিজ্ঞানকেও নতুন দিশা দিতে পারে। সভাগৃহের সামনে প্রদর্শনী ও সংস্কৃতভাষায় রচিত বইয়ের স্টলের আয়োজন করা হয়। ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ভারতীর 'পত্রাচার সংস্কৃতম্' কোর্সে রেজিস্ট্রেশনেরও ব্যবস্থা ছিল সভাগৃহের সামনে।

উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ মেলা

রামকৃষ্ণ আশ্রমের কুলার (ঠাণ্ডা) টেন্ট ও কোমোডের পায়খানা ব্যবস্থা আছে

রবি গ্রহ মেষ রাশিতে প্রবেশ করলে চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৩/৪) থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়। এই একমাসের যে কোনোদিন মানত করে স্নান ও গরিব এবং সাধুদের দান করলে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়। সেই জন্য কুম্ভস্নান এত প্রসিদ্ধ।

তিথি দেখে যাঁরা স্নান করবেন

১৩/৪ চৈত্র সংক্রান্তি	১১/৫ পঞ্চমী
১৪/৪ পয়লা বৈশাখ (শাহী)	১৭/৫ মোহিনী একাদশী
২২/৪ পূর্ণিমা	১৯/৫ শুক্লা ত্রয়োদশী
৬/৫ অমাবস্যা (শাহী)	২১/৫ বুদ্ধপূর্ণিমা (শাহী স্নান)
৯/৫ অক্ষয় তৃতীয়া	

৫ দিন থাকা-খাওয়া ৩৫০০/-

রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৬৭, লেনিন সরণী, তালতলা, কলকাতা-১৩

ফোন : ০৩৩-২২৬৫ ৬৭০৪, মো: ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদহ জেলার সামসী মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ কাজলকুমার দাসের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে গত ৪ মার্চ তাঁর মা আরতি দাস পুত্র ও নববধূর হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য চন্দন সেনগুপ্তর হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ দিবাকর দাস, জেলা শারীরিক প্রমুখ যোগেন সরকার সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক লালবচন পাল তাঁর পুত্র অভিষেক পালের শুভ বিবাহের বৌভাত অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর মিত্রের হাতে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য রাজেশ মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি তার গ্রাম বলরামপুরের বাড়িতে তাঁরা বাবা মিলন মুখোপাধ্যায় ও মা শ্রীমতী নিলীমাদেবী মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন শিশুমন্দিরের সভাপতি তথা প্রবীণ স্বয়ংসেবক অনিল কুমার মাহাতোর হাতে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের খাতড়া (পশ্চিম) মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ দত্ত, আচার্য-আচার্যা-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক ও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা শিখা কুণ্ডুর পুত্র ঋতমের শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে গত ১৩ মার্চ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ- সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল, ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। উল্লেখ্য, ঋতম বাঁকুড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক

সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডলের দৌহিত্র।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া বিভাগ সম্পাদক বলরাম সাঁতরা ও শ্রীমতী ভারতী সাঁতরার পুত্র দেবদত্ত'র শুভ বিবাহে বড়জোড়ায় আয়োজিত প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২ মার্চ মঙ্গলনিধি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নবদম্পতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া বিভাগ সংগঠন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ পাল, বাঁকুড়া জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ সুন্দর মণ্ডল পুরুলিয়া জেলা সহ-সভাপতি হীরেন হালদার, বাঁকুড়া জেলা সংগঠন সম্পাদক বুবাই নস্কর, কার্যালয় প্রমুখ অশোক বাউরি, জেলার বজরং সহ-সংযোজক কৃষ্ণ মণ্ডল জেলা, সমিতির সদস্য ও প্রখণ্ড সভাপতি তপন মিশ্র, সম্পাদক শ্রীমন্ত মণ্ডল, সুদীপ রায় সহ বহু কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৩ মার্চ বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা খণ্ডের গড়গড়িয়া গ্রামের কার্যকর্তা ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতি মনতোষ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা চিন্ময়ী বসু'র শুভ বিবাহে 'মঙ্গলনিধি' প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা অনিল মাহাত, খাতড়া পশ্চিম মহকুমা কার্যবাহ গৌতম মাহাত, বিভাগ প্রচারক আশিস কুমার পাল, জেলা প্রচারক সৃজন কুমার হাজরা ও বহু আত্মীয়-স্বজন- বন্ধু বান্ধব।

শোকসংবাদ

পরলোকে বৃন্দাবনধর গোস্বামী

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বৃন্দাবনধর গোস্বামী গত ২৩ মার্চ, দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি সহধর্মিণী, একমাত্র কন্যা, জামাতা ও দুই নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন।

১৯৪২ সালে তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। নদীয়া জেলা কার্যবাহ, জেলা সঙ্ঘচালক, বিভাগ সঙ্ঘচালক ও অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য প্রভৃতি দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে তিনি পালন করেন। শ্রী গুরুজী থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত সরসঙ্ঘচালকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। দীর্ঘদিন তাঁর বাড়ি সঙ্ঘ-কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুস্থ থাকা অবস্থায় তিনি শাখায় যাননি এমন কোনোদিন হয়নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্ঘকার্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি নবদ্বীপ সারদা শিশুতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা, যা নবদ্বীপবাসীদের কাছে আজও গর্বের। কৃষ্ণনগর জেলা কার্যালয় নির্মাণের পিছনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সদাহাস্যময়, অজাতশত্রু, স্বনামধন্য, আমৃত্যু স্বয়ংসেবক প্রয়াত বৃন্দাবনধর গোস্বামীকে হারিয়ে নবদ্বীপ তথা নদীয়া বিভাগের সকলেই শোকাহত, পরমেশ্বরের নিকট আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ জেলার গাজোল মহকুমা কার্যালয়ের গৃহকর্তা বিজনবিহারী উপাধ্যায় গত ২৫ মার্চ পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ছাত্রদরদি প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক। ভারতীয় জনতাপার্টির গাজোল মণ্ডলের সভাপতি রূপে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সদা হাস্যময় সঙ্ঘ অনুরাগী ও স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক। রেখে গেছেন স্ত্রী, পঞ্চকন্যা, নাতি-নাতনি ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধ বান্ধব। সঙ্ঘ ও স্বস্তিকার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

* * *

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা খণ্ডের বারপেট্যা শাখার স্বয়ংসেবক সঞ্জয় কুণ্ডু ও সুজিত কুণ্ডু'র মাতৃদেবী জয়ন্তী কুণ্ডু গত ২৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি স্বামী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, এদের পিতৃদেব সাধন চন্দ্র কুণ্ডু ২০ ফেব্রুয়ারি ভোরে বাজার যাওয়ার সময় পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁরও বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। এরকম মর্মান্তিক ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। সমবেদনা জানাতে স্বয়ংসেবকরা তাঁর বাড়িতে যান।

Sresth Products Private Ltd.

Regd. Off.-
49, Strand Road, Kolkata-700 007

Admn. Off. -
67/50, Strand Road, Kolkata-700 007

With Best Compliments from :

M. L. Pareek, FCA

Kotilya Consultants Limited

16-B, Shakespeare Sarani
B. K. Market, 1st Floor, Kolkata - 700 071

NATARAJ TEXTILES

Mfgr:- Knitted Fabrics

129-A, Muktarambabu Street,

Kolkata - 700 007,

Telephone : 2241-8903

SHREE VENKATESH PAPER MART

"KARWA HOUSE"

64, NALINI SETH ROAD, KOLKATA-700 007

Email : svp@cal2.vsnl.net.in / svpoo7@dataone.in

Distributors :

PAPER & PAPER BOARD

Phone : 2274-5398, 2274-0889, 2274-2447, Mobile : 9830026151, Fax : 2274-2164

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

With Compliments
From-

MARCO POLO PRODUCTS (P) LTD

With Compliments
From-

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

EPC (I) Pvt. Ltd.

117, B. L. Saha Road
Kolkata - 700 041
Phone :- 2403-3443, Email - epc@cal2.vsnl.net.in

Manufacturer of TEMPEST Fans

QUALITY CERTIFIED BY - ISO 9002

SURYA
Energising Lifestyles
WHY SURYA LED ?
Wide beam angle for better light spread
The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of
Eco Friendly
Instant Lighting
Low Maintenance
High Energy Efficiency
High Power Factor
Lasts upto 25000 hrs
Wide Operating Voltage Range*
WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS
SURYA LED
5W MRP ₹350/-
www.surya.co.in
lighting
fans
appliances
pipes
*voltage range 100V - 300V
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!